

ইসলামে দাসবিধি

[Bengali - বাংলা - بنغالي]

আবদুল্লাহ নাসেহ উলওয়ান

১৩৯৫

অনুবাদ

প্রফেসর ড. মো: আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া



مبادرة رعاية المجتمع، تونسي، غازيبور
Community Welfare Initiative, Tongi, Gazipur-1700
Mobile : +88 01575 547999, Email : info@cwibd.com

نظام الرق في الإسلام

(باللغة البنغالية)

عبد الله ناصح العلوان

ترجمة

د/ محمد أمين الإسلام

مراجعة

الأستاذ د/ أبو بكر محمد زكريا

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.....

ইসলামে দাস বিধি গ্রন্থে দাসপ্রথার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং দাস-দাসীর অধিকার ও মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের মুক্তির জন্য ইসলামের বহুমুখী ব্যবস্থা এবং দাসপ্রথা তাৎক্ষণিকভাবে বিলুপ্ত না করার কারণ ও প্রেক্ষাপট যুক্তিনির্ভরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রন্থটি এ বিষয়ে প্রচলিত বিভিন্ন সংশয় ও ভুল ধারণা নিরসনে সহায়ক হবে।

সূচিপত্র

ক্র	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	৩
২	মুখবন্ধ	৫
৩	দাসপ্রথা সম্পর্কে ঐতিহাসিক কিছু কথা	৯
৪	দাসত্বের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান	১৩
৫	দাস-দাসীর সাথে ইসলাম কেমন আচরণ করে?	২৫
৬	কীভাবে ইসলাম দাস-দাসীকে মুক্তি দিয়েছে?	৩৮
	উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি দান	৪১
	কাফ্যারা প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি দান	৪৬
	লিখিত চুক্তির মাধ্যমে মুক্তি দান	৪৯
	রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে মুক্তি দান	৫৪
	সন্তানের মা (উম্মুল ওলাদ) হওয়ার কারণে মুক্তি দান	৫৭
	নির্যাতনমূলক প্রহারের কারণে মুক্তি দান	৫৯
৭	ইসলাম কেন দাসপ্রথাকে চূড়ান্তভাবে বাতিল করেনি?	৬৫
	আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি	৬৫
	রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি	৬৭
	আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি	৬৯
	সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি	৭০
	শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি	৭৩
৮	বর্তমান বিশ্বে দাসপ্রথা আছে কি?	৭৭
৯	বৈধভাবে দাস-দাসী গ্রহণের বিধান	৮৪
১০	অতএব, হকের অনুসন্ধানীগণ!	৯২

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জনগণ ও রাষ্ট্রের সংশোধন ও সংস্কারের জন্য শরীয়ত অবতীর্ণ করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর ওপর, যিনি মানুষকে যুলুম ও দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবী ও তাবেঈগণের ওপর, যাঁরা যমীনে আল্লাহর একত্ববাদ, স্বাধীনতা ও জ্ঞানের নীতিমালা প্রচার করেছেন। তাঁদের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক, যাঁরা কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত তাঁদের দাওয়াত দ্বারা অন্যকে দাওয়াত দান করেন এবং তাঁদের পথনির্দেশের দ্বারা যথাযথভাবে হেদায়াত লাভ করেন।

অতঃপর:

আমার ‘কিসসা তুল হিদায়াহ’ (হেদায়াতের গল্প) গ্রন্থটিতে কয়েকটি মূল্যবান বক্তৃতা (Lecture) ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাঠক এগুলো গল্পের উপযুক্ত স্থানে স্থানে ছড়িয়ে থাকতে দেখতে পাবেন।

অতঃপর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি আলোচনাগুলো একটার পর একটা বের করে আনব এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তা দেখব। অতঃপর যখন আলোচনাটিতে কোনো কিছু বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে, তখন আমি তাতে বৃদ্ধি করব, আর যখন ওখানে কোনো কিছু কাটছাট করা জরুরি মনে করব, তখন তা কাটছাট করবে... শেষ পর্যন্ত যখন আমি তার পরিমার্জন ও পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ করব, তখন আমি বক্তব্য বা আলোচনাটি ‘বাহুসুন ইসলামিয়াতুন হাম্মাহ’ (بحوث إسلامية هامة) [গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী আলোচনা] নামক সিরিজের অন্তর্ভুক্ত করব। আশা করা যায় ‘সিরিজ’—এর পাঠকগণ এসব বক্তৃতা ও আলোচনা থেকে উপকৃত হবেন এবং আরও আশা করা যায় যে, তারা এসবের মধ্যে এমন অনেক প্রশ্নের

সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে যাবেন, যেগুলো ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে করা হয়ে থাকে। আর তা ইসলামের শত্রুদের অকপট সাক্ষ্যের মাধ্যমেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে যাবে।

আর এসব বক্তৃতাসমূহ (Lecturers) থেকে তার প্রাসঙ্গিক স্থানে দেওয়া আমার বক্তব্যের মধ্যে অন্যতম একটি বক্তৃতা হলো “আর-রিকু ফিল ইসলাম” (الرق في الإسلام) (ইসলামে দাস), যে বক্তৃতাটি তার যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল যখন আবুল ফাতহ এর মত ব্যক্তিত্বদের উত্থান ঘটেছিল।

প্রিয় পাঠক! অবশ্যই আপনি ‘দাস’ প্রবন্ধের আলোচনায় ‘দাসপ্রথা’কে কেন্দ্র করে ইসলামের শত্রুগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রত্যেকটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে যাবেন অকাট্য দলীল, গ্রহণযোগ্য কারণ এবং সুন্দর ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে।

আমি আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিম যুবকদেরকে সুপথ ও সঠিক বুঝ দান দান করেন, তাদেরকে ঈমান ও জিহাদের উষ্ণতার দ্বারা দাওয়াতিমূলক কর্মকাণ্ডের দিকে ধাবিত করেন এবং এই উম্মতের প্রতি সম্মান, শক্তি ও জাগরণের উপায়সমূহ নির্দেশ করেন, যাতে আমরা আমাদের নিজ চোখে ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন অবস্থায় এবং মুসলিমদের রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দেখতে পারি; আর এটা আল্লাহর জন্য কঠিন বা কষ্টকর কোনো কাজ নয়।

লেখক

মুখবন্ধ ও ভূমিকা

প্রাচীন ও আধুনিক কালে ইসলামের শত্রুরা, বিশেষ করে তথাকথিত সাম্যবাদীরা ইসলামের শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে অপবাদ ও অভিযোগের মরীচিকা এবং সন্দেহ ও সংশয়ের ফেনা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে...

এর লক্ষ্য হলো: মুসলিম প্রজন্মের মধ্যে নাস্তিকতার বীজ বপন করা, আল্লাহর দেওয়া শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে যুবকদের মধ্যে সন্দেহের ধূম্জাল সৃষ্টি করা এবং মুসলিম জাতিকে অপরাধমূলক স্বেচ্ছাচারিতা, লাম্পট্য, নাস্তিকতা, কুফরী, নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডের দিকে ঠেলে দেওয়া...

আর বিদ্বৈষমূলক প্ররোচনার মধ্য থেকে যেগুলোকে তারা শিক্ষিত সভ্য-সমাজের মধ্যে উস্কানি দিয়ে উল্লেখ করে থাকে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে— ইসলাম কর্তৃক দাসপ্রথার বৈধতা প্রদান, যা তাদের দৃষ্টিতে মানুষের স্বাধীনতার সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন; আর তারা এ ধরনের যুলুম মার্কী অভিযোগ এনে ইসলামের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টির পঁয়তারা করে থাকে। এর মাধ্যমে তারা ইসলামের মূলনীতিসমূহের মধ্যে অপবাদ দেওয়ার উপায় আবিষ্কার করে, যাতে তারা মুসলিম সমাজ ও ইসলামের অনুসারী প্রজন্মের মধ্যে নাস্তিকতা ও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নীতিমালা প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাদের গুপ্ত উদ্দেশ্য ও নিকৃষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়।

যখন বেশ কিছু মুসলিম যুবক এসব উদ্দেশ্যমূলক অপবাদ ও অপরাধমূলক সন্দেহের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করল, তখন তারা আলেমদের নিকট এসব প্রশ্ন করা শুরু করে: কীভাবে ইসলাম দাসত্বকে বৈধ করেছে এবং তাকে তার নিয়মনিতির অন্তর্ভুক্ত করেছে? অথবা কীভাবে ইসলাম মানুষকে মনিব ও দাস বলে শ্রেণিবিভাগ করতে চায়? অথবা কীভাবে যে আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে সম্মানিত করেছেন, তিনি তাকে দাস-দাসীর বাজারে

ক্রয়-বিক্রয় করতে চান, যেমনিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজারে পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা হয়? আর আল্লাহ তা‘আলা যখন এতে সম্মতই না হবেন, তাহলে তিনি কেন তাঁর সম্মানিত কিতাবে (আল-কুরআনুল কারীমে) দাস-দাসী প্রথা বাতিল করে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেননি, যেমনিভাবে তিনি মদ, জুয়া, সুদ ও যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বক্তব্য পেশ করেছেন, যা ইসলাম হারাম করে দিয়েছে?

যদিও মুমিন যুবক ভালোভাবেই জানে যে, ইসলাম হলো সত্য ও স্বভাব দীন, কিন্তু তার অবস্থা ইবরাহীম খলিল ‘আলাইহিস সালামের মতো; কেননা আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالِ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيُظْمِنَ قُلُوبِي﴾ [البقرة: ১৬০]

“তবে কি আপনি ঈমান আনেননি? তিনি বললেন, ‘অবশ্যই হ্যাঁ, কিন্তু আমার মন যাতে প্রশান্ত হয়!’ [সূরা আল-বাকারাহ: ২৬০]

নিঃসন্দেহে একজন বিবেকবান ও চিন্তাশীল মানুষ যখন স্বজনপ্রীতি মুক্ত বা নিরপেক্ষ হয়, আর সাথে সাথে সে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত থাকে এবং তার অন্তরকে সত্য গ্রহণের জন্য, বিবেককে যুক্তি গ্রহণের জন্য এবং দৃষ্টিকে আলো উপভোগ করার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে সত্য ও বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেওয়া এবং রব (প্রতিপালক) প্রদত্ত নিয়মনীতিকে গ্রহণ করে নেওয়া, যার সামনে ও পিছন থেকে অসত্য ও অকার্যকর কিছু আসবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝﴾

[المائدة: ১৫-১৬]

“আমাদের রাসূল তোমাদের নিকট এসেছেন, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে তিনি সে সবার অনেক কিছু তোমাদের নিকট প্রকাশ করছেন এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিচ্ছেন। অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, এ দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং তাদেরকে নিজ অনুমতিক্রমে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান। আর তাদেরকে সরল পথের দিশা দেন।” [সূরা আল-মায়িদা: ১৫-১৬]

আল্লাহ তা‘আলার দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করে ইসলামে দাস-প্রথার অবস্থান, এর সার্বিক প্রেক্ষাপট ও নীতিমালা সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করছি। এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো—যারা সত্য অনুসন্ধান করতে চান, তারা যেন স্পষ্টভাবে জানতে পারেন যে, ইসলাম দাস-দাসীর প্রতি কেমন মানবিক আচরণ নিশ্চিত করেছে, তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য কী কী ইতিবাচক পথ উন্মোচন করেছে এবং একটি মাত্র বিশেষ বাধ্যবাধকতা ছাড়া দাস-দাসী বানানোর অন্যান্য সকল অন্যায় উৎসকে কীভাবে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে।

বিষয়টির সকল দিক সুসংহত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের জন্য আমি আলোচনাটিকে নিম্নোক্ত সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা উত্তম মনে করছি:

- **প্রথমত:** দাসপ্রথা সম্পর্কে ঐতিহাসিক কিছু কথা
- **দ্বিতীয়ত:** দাসত্বের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান
- **তৃতীয়ত:** দাস-দাসীর সাথে ইসলাম কেমন আচরণ করে?
- **চতুর্থত:** কীভাবে ইসলাম দাস-দাসীকে মুক্তি দিয়েছে?
- **পঞ্চমত:** কেন ইসলাম দাসপ্রথাকে চূড়ান্তভাবে বাতিল করেনি?
- **ষষ্ঠত:** বর্তমান বিশ্বে দাসপ্রথা আছে কি?
- **সপ্তমত:** বৈধভাবে দাস-দাসী গ্রহণের বিধান কী?

আমি এই সাতটি বিষয়ের প্রত্যেকটি পয়েন্ট নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব। আর সঠিক পথ দেখানোর দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহর এবং তাঁর কাছেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।

==O==



দাসপ্রথা সম্পর্কে ঐতিহাসিক কিছু কথা

১. ইসলামের আগমন হয়েছে এমতাবস্থায় যে, দাস-দাসীর ব্যাপারটি ছিল গোটা বিশ্বের সকল প্রান্তে একটি স্বীকৃত প্রথা ও ব্যবস্থাপনা, বরং তা ছিল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বা কর্মতৎপরতা এবং সামাজিক প্রচলন, যাকে কোনো মানুষ অস্বীকার করতে পারে না; আর কোনো মানুষ তার পরিবর্তনের সম্ভাব্যতার ব্যাপারে চিন্তাও করতে পারে না!!
২. ইসলামের পূর্বে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে দাস বানানোর উৎস ছিল বিভিন্ন ধরনের:
 - যুদ্ধসমূহে দাস-দাসী বানানোর প্রবৃত্তি এবং জনগোষ্ঠীর রক্ত শোষণ করা।
 - দারিদ্রতার কারণে অথবা ঋণ পরিশোধ করতে না পারার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দাস-দাসীতে পরিণত করা।
 - চুরি অথবা হত্যার মতো মারাত্মক ধরনের অপরাধে জড়িয়ে যাওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দাস-দাসীতে পরিণত করা।
 - মাঠের মধ্যে কাজ করা এবং তাতে অবস্থান করার জন্য কোনো ব্যক্তিকে দাস-দাসীতে পরিণত করা।
 - ছিনতাই বা অপহরণ এবং বন্দী করার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে দাস-দাসীতে পরিণত করা।
 - অভিজাত শ্রেণি ও বড় লোকদের সাথে অসদ্ব্যবহার করার কারণে কোনো ব্যক্তিকে দাস-দাসীতে পরিণত করা।

এগুলো ছাড়াও আরও নানা ধরনের উৎস রয়েছে, যেগুলোকে তারা মানুষের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য ন্যায়সঙ্গত কারণ বলে বিবেচনা করে এবং তাকে মনিবদের সামনে অনুগত দাস বা দাসে পরিণত করে!!

৩. রোমান, পারস্য, ভারত, চীন, গ্রীক প্রভৃতি রাজ্যে দাস-দাসীর সাথে আচরণ ছিল বর্বর ও নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে। সেখানে তার মানবতা ছিল উপেক্ষিত, তার সম্মান ছিল ভুলুষ্ঠিত এবং কাজের ক্ষেত্রে তার জবাবদিহীতা ছিল অত্যন্ত কঠিন, যদিও এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার পরিধির মধ্যে কম-বেশি পার্থক্য ছিল।

রোমান সমাজে দাস-দাসীর সাথে আচরণের কিছু নমুনা আপনার সামনে তুলে ধরছি:

রোমান জাতির নিকট যুদ্ধ বা আগ্রাসন ছিল জনগোষ্ঠীকে দাস-দাসী বানানোর অন্যতম মূল উৎস বা উৎপত্তিস্থল। আর এই আগ্রাসন কোনো সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ও নীতির ওপর ভিত্তি করে সংঘটিত হতো না, বরং তার একমাত্র কারণ ছিল অন্যদেরকে দাস বানানো এবং তাদেরকে তাদের বিশেষ স্বার্থে ও ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিলের জন্য নিজেদের অধীনস্থ করা।

আর তা এ জন্যে যে, যাতে রোমানরা অহংকারী ও বিলাসবহুল জীবন-যাপন করতে পারে, শীতল ও উষ্ণ গোসলখানাসমূহ দ্বারা (আরাম) উপভোগ করতে পারে; আরও উপভোগ করতে পারে অহংকারী পোশাক এবং রঙ-বে-রঙের সুস্বাদু খাবারসমূহ, বরং তারা ডুবে থাকবে অহংকারময় ভোগ-বিলাসে এবং মদ, নারী, নৃত্য, অনুষ্ঠানাদি এবং বিভিন্ন পর্ব ও উৎসবের মত পাপ-পঙ্কিলময় আমোদ-প্রমোদে।

এই জন্যই অপর জনগোষ্ঠীকে দাস-দাসী বানানো, তাদের রক্ত শোষণ করা এবং তাদের নারী-পুরুষদেরকে দাস-দাসী হিসেবে মালিকানা গ্রহণ করাটা আবশ্যিক ছিল!!

এই পাপ-পঙ্কিলময় কামনা-বাসনার পথ ধরেই গড়ে উঠে রোমানীয় উপনিবেশবাদ এবং দাসপ্রথা, যার উৎপত্তি এই উপনিবেশ থেকেই।

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে দাস-দাসীদের প্রতি চরম নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো:

- মাঠে-ময়দানে কাজ করার সময় তাদের পায়ে ভারী লোহার বেড়ি পরিয়ে রাখা হতো, যাতে তাদের কোনোভাবেই পালিয়ে যেতে না পারে।
- তাদেরকে কেবল অতটুকুই খাবার দেওয়া হতো, যা দিয়ে কোনোমতে প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখা যায়। এর উদ্দেশ্য ছিল তাদের পশুর মতো অনুগত রাখা।
- কোনো কারণ ছাড়াই কাজ করার সময় তাদের চাবুক মেরে তাড়ানো হতো। স্বাধীন মানুষের শাস্তিভোগের এই দৃশ্য দেখে মনিবরা এক ধরনের অনৈতিক ও বিকৃত আনন্দ পেত।
- বাতাসহীন ও দুর্গন্ধময় জেলখানায় গাদাগাদি করে ৫০ জন বা তার বেশি দাসকে একসাথে শিকলবদ্ধ রাখা হতো। যেখানে মাটির নিচে পোকা ও ইঁদুরের অবাধ বিচরণ ছিল।
- তাদেরকে তরবারী ও বর্শা (বল্লম) দ্বারা প্রতিযোগিতার আসরে ঠেলে দেওয়া হতো। তারপর সেই আসরে মনিবরা সমবেত হতো তাদের নিজ নিজ দাসের পারস্পরিক তরবারীর আক্রমণ ও বর্শা নিক্ষেপ প্রতিযোগিতার দৃশ্য অবলোকন করার জন্য। এক্ষেত্রে তাদের নিহত হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি জরুরি করা হতো না; বরং মনিবদের আনন্দ-উল্লাস চরম পর্যায়ে পৌঁছাতো, ফ্লোগানে ফ্লোগানে কণ্ঠস্বর প্রচণ্ড ধ্বনিতে পরিণত হতো, হাততালিতে মুখর হয়ে উঠত পরিবেশ এবং যখন প্রতিযোগীদের কোনো একজন তার সঙ্গীর জীবন বিপন্ন করে দিতো, তখন তাদের সৌভাগ্যের অউহাসি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ত। তারপর তার নিষ্প্রাণ দেহকে যমীনের উপর নিক্ষেপ করত!!

আর সর্বজন বিদিত যে, সেই সময়ে রোমানীয় আইন-কানুন এমন ছিল, যা মনিবের জন্য তার দাসকে হত্যা করা, শাস্তি দেওয়া, অধীনস্থ করা ও বেড়ি পরিয়ে রাখার ব্যাপারে সাধারণ ও অবাধ অধিকার প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে দাস কর্তৃক অভিযোগ পেশ করার কোনো অধিকার ছিল না এবং সেখানে এমন কোনো পক্ষ ছিল না, যারা এই অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দিবে অথবা তা স্বীকার করে নিবে; কারণ দাস-দাসীরা ছিল রোমানীয় আইন-কানুনের দৃষ্টিতে জীব-জানোয়ার বা তাদের চেয়েও অধম। ফলে মনিব তার কর্মকাণ্ডের কোনো প্রকার জবাবদিহিতার তোয়াক্কা না করেই তার সাথে খেয়াল-খুশি মতো আচরণ করত। তারা মনে করত, দাসের ব্যাপারে তাদেরকে আবার কিসের জিজ্ঞাসাবাদ!!

এ হচ্ছে ইসলাম পূর্ববর্তী সময়কার দাস-দাসীর অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

প্রিয় পাঠক, সহসাই আপনি এই পার্শ্বিক নিষ্ঠুরতা এবং ইসলামী শরীয়াহ'র হৃদয়তাপূর্ণ ও কোমল অনুশাসনের মাঝে একটি স্পষ্ট পার্থক্য প্রত্যক্ষ করবেন। কেননা প্রচলিত একটি প্রবাদ রয়েছে “বিপরীত বস্তু দ্বারাই প্রকৃত শ্রেষ্ঠটি বেরিয়ে আসে”।

==O==

দাসত্বের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান

অল্প কিছুক্ষণ পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলামের আগমন ঘটেছে এমন অবস্থায় যে, দাসত্ব একটি আন্তর্জাতিক প্রথা, যা বিশ্বের সকল রাষ্ট্র ও জাতির নিকট স্বীকৃত; বরং দাসত্ব ছিল গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং সামাজিকভাবে প্রচলিত জরুরি বিষয়, যাকে কোনো মানুষ অপছন্দ করত না এবং তা রদবদল করার সম্ভাব্যতার ব্যাপারে কেউ চিন্তাও করত না।

ইতঃপূর্বে আমরা এটিও আলোচনা করেছি যে, ইসলামপূর্ব সময়ে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহে দাসত্বের উৎসধারা বা উৎপত্তিস্থলসমূহ ছিল বিভিন্ন প্রকৃতির, বিভিন্ন পদ্ধতির এবং ঐক্যবদ্ধ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সংবলিত!!

এমতাবস্থায় ইসলাম কী করেছে?

ইসলাম প্রাচীনকালের দাসত্বের উৎসলসমূহ থেকে একটি ব্যতীত বাকী সবগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছেও। সে একটি উৎস বন্ধ না করার কারণ হচ্ছে—এ উৎসটি বন্ধ করা তার আওতাধীন ছিল না; কারণ সে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহের ময়দানে আন্তর্জাতিকভাবে বহুল স্বীকৃত ছিল যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত দাসত্বের প্রথাটি। তাই যে উৎসটি ইসলামে অবশিষ্ট ছিল, তা হলো যুদ্ধের মাধ্যমে সংঘটিত দাসত্ব।

এখন আমরা সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব:

সেই সময় বহুল প্রচলিত ও প্রভাব বিস্তারকারী প্রথা ছিল, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী বানানো অথবা তাদেরকে হত্যা করা।^(১)

১. ‘তারীখুল ‘আলম’ নামক ঐতিহাসিক বিশ্বকোষের ২২৭৩ পৃষ্ঠায় এসেছে, যার ভাষ্য হলো—“৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে রোমানীয় সম্রাট ‘মুরীস’ তার অর্থলোভের কারণে ‘খান আল-

এ প্রথাটি ছিল খুবই প্রাচীন, যা ইতিহাসের অন্ধকার যুগের গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। তা প্রথম মানুষ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তনের উপক্রম হতে পারে; কিন্তু তা মানবতার জন্য তার বিভিন্ন ধাপে নিত্য সঙ্গী হয়ে পড়ে।

মানুষের এই পরিস্থিতিতে ইসলামের আগমন ঘটল এবং ইসলাম ও তার শত্রুদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ফলে মুসলিম যুদ্ধবন্দীরা ইসলামের শত্রুদের নিকট দাসে পরিণত হলো, অতঃপর হরণ করা হলো তাদের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি এমন দুঃখ-কষ্ট ও যুলুমের শিকার হতে লাগল, যে আচরণ ঐ সময় দাস-দাসীদের সাথে করা হতো!!

ইসলামের পক্ষে সেই সময় সম্ভব ছিল না যে, তার হাতে শত্রুদের মধ্য থেকে যারা যুদ্ধবন্দী হবে তাদেরকে সাধারণভাবে ছেড়ে দেওয়া। আর এটা সুন্দর রাজনৈতিক দর্শনও নয় যে, তুমি তোমার শত্রুকে তার যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে তোমার ব্যাপারে আরও উৎসাহিত করবে, যখন তোমার পরিবার, তোমার আত্মীয়-স্বজন ও তোমার দীন-ধর্মের অনুসারীরা ওইসব শত্রুদের নিকট লাঞ্ছনা, অপমান ও শাস্তির শিকার।

এমতাবস্থায় সেখানে সমান নীতি অবলম্বন করাটাই অধিক ন্যায়সঙ্গত নিয়ম, যার প্রয়োগ শত্রুতা প্রতিরোধে সক্ষম হবে, বরং এটাই একমাত্র ও অনন্য নিয়ম।

==O==

আওয়ার’ এর হাতে বন্দী হাজার হাজার যুদ্ধবন্দীকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়িয়ে আনতে অস্বীকার করে। ফলে ‘খান আল-আওয়ার’ তাদের সকলকে হত্যা করে।”

ইসলামের দৃষ্টিতে যে যুদ্ধ যুদ্ধবন্দীদের দাস-দাসীতে পরিণত করার বিধানকে অনুমোদন করে, তা হলো শরীয়তসম্মত যুদ্ধ (জিহাদ)। আর শরীয়তসম্মত যুদ্ধ হলো সেই যুদ্ধ, যা নিম্নোক্ত মৌলিক শর্তের ওপর ভিত্তি করে সংঘটিত হয়:

১. আল্লাহর পথে শত্রুর সাথে লড়াই হবে আল্লাহর কথাকে বাস্তবায়ন করার জন্য। তিনি বলেন,

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: ৭৬]

“যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে।” [সূরা আন-নিসা: ৭৬] এর অর্থ হলো—ইসলামে যুদ্ধের বিষয়টি বিজয় লাভের আকাঙ্ক্ষা, সুবিধা ভোগ করার লোভ এবং খ্যাতি ও সম্মান লাভের উদ্দেশ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আরও প্রতিষ্ঠিত নয় উপনেশবাদ ও স্বৈচ্ছাচারিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের ওপর। যুদ্ধের এই বিষয়টি বিধিসম্মত করা হয় মূলত মানবজাতির হেদায়াত ও তাদেরকে সংশোধন করার জন্য, মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসার জন্য, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে তার প্রশস্ততার পথ দেখানোর জন্য এবং (বাতিল) ধর্মসমূহের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি থেকে বের করে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের দিকে নিয়ে আসার জন্য।

আল্লাহর পথে লড়াই হতে হবে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অধীনে:

(ক) মুসলিমদের পক্ষ থেকে আত্মসন প্রতিরোধ করার জন্য। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

[البقرة: ১৯০]

“আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।” [সূরা আল-বাকারাহ: ১৯০]

(খ) বিদ্রোহী শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য, যারা জোর-জবরদস্তি করে মানুষকে তাদের দীনের ব্যাপারে ফিতনা বা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: ৩৭]

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফেৎনা দূর হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।” [সূরা আল-আনফাল: ৩৯]

(গ) তাগুতকে অপসারণ ও পথভ্রষ্ট স্বেচ্ছাচারী শক্তিকে উৎখাত করার জন্য, যা ইসলামী দাওয়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং জনগণের নিকট যাতে তা না পৌঁছতে পারে সেজন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝﴾ [النساء: ৭৬]

“আর যারা কাফের, তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। কাজেই তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল।” [সূরা আন-নিসা: ৭৬]

(ঘ) চুক্তি সম্পাদন করার পর তা ভঙ্গ করার কারণে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝﴾ [التوبة: ১২]

“আর যদি তারা তাদের চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্বন্ধে কটুক্তি করে, তবে কুফরের নেতাদের সাথে যুদ্ধ কর; এরা এমন লোক যাদের কোনো প্রতিশ্রুতি নেই; যেন তারা নিবৃত্ত হয়।” [সূরা আত-তাওবা: ১২]

২. মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কোনো জাতির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া বৈধ হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদেরকে সতর্ক করবে এবং তার নিকট তিনটি বিষয় পেশ করবে:

(ক) ইসলাম

(খ) জিযিয়া

(গ) যুদ্ধ

- যদি তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং সত্য দীনের অনুসরণ করে, তাহলে পরস্পরের মধ্যে কোনো প্রকার যুদ্ধ, ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতা করার অবকাশ নেই, বরং তাদের অবস্থা মুসলিমদের অবস্থার মতো হয়ে যাবে। আমাদের জন্য যা থাকবে, তাদের জন্যও তাই থাকবে। আমাদের ওপর যে দায়-দায়িত্ব থাকবে, তাদের ওপরও সে দায়-দায়িত্ব থাকবে। তাকওয়া (আল্লাহ ভীতি) ও সৎ কাজের মানদণ্ড ব্যতীত একজনের ওপর অন্য জনের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না।
- আর তারা যদি ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে এবং ইসলামী শাসনের ছায়ায় থেকে তাদের আকীদা-বিশ্বাসকে লালন করতে চায়, তবে মুসলিমগণ কর্তৃক তাদের নিরাপত্তা বিধানের বিনিময়ে ‘জিযিয়া’ কর প্রদানের শর্তে কারও পক্ষ থেকে কোনো প্রকার চাপ অথবা জোর-জবরদস্তি ছাড়াই তাদের জন্য এ ধরনের স্বাধীনতা থাকবে।^(২) আর এই ব্যাপারটি বিস্তৃত হবে ইসলামে প্রবেশ করা এবং তাদের ধর্ম-কর্ম পালনের ক্ষেত্রে, যে ব্যাপারটিকে তাগিদ করে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ২০৬]

-
২. মুসলিমগণ যদি তাদের নিরাপত্তা বিধানে অক্ষম হয়, তাহলে তাদের কর্তব্য হলো তাদের প্রদত্ত ‘জিযিয়া’ কর তাদের নিকট ফেরত দেওয়া, যেমন ব্যবহার করেছিলেন আবু উবায়দা রাঈয়াল্লাহু ‘আনহু ‘হীরা’-এর পার্শ্ববর্তী শহরবাসীদের সাথে।

“দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে।” [সূরা আল-বাকারাহ: ২৫৬]

মুসলিম বিশ্বে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান কর্তৃক তাদের ধর্মের ওপর বর্তমান সময় পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকা এমন একটি অকাট্য দলিল, যাতে কোনো বিতর্ক করার সুযোগ নেই যে, ইসলাম বলপ্রয়োগ ও তরবারীর জোরে অন্যকে তা (ইসলাম) গ্রহণ করতে বাধ্য করেনি।

আর এর পক্ষে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান ‘টমাস আরনুলদ’ তার ‘আদ-দাওয়াত ইলাল ইসলাম (ইসলামের দিকে আহ্বান) নামক গ্রন্থে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

- যদি তারা ইসলাম গ্রহণ কিংবা ‘জিযিয়া’ কর প্রদান—কেনোটিই দিতে সম্মত না হয়, তবে তাদেরকে বিদ্রোহী ও অপরাধী গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ, তাদের এই অবস্থান মূলতঃ জনগণের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছানোর পথে সরাসরি বাধা হয়ে দাঁড়ানোরই নামান্তর।

কেবল এই চরম অবস্থাতেই তাদের বাধা অপসারণের লক্ষ্যে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে মুসলিমরা ছুট করেই যুদ্ধে লিপ্ত হন না। রক্তপাত এড়িয়ে ‘জিযিয়া’ করের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির শেষ সুযোগ দেওয়ার জন্য আগে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধের চূড়ান্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়; এরপরই কেবল তারা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

৩. যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যখন শত্রুরা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়বে, তখন মুসলিমদের উচিত আল্লাহ তা‘আলার বাণী বাস্তবায়নের জন্য সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়া। যেমন তিনি বলেন,

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنفال:

“আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করুন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” [সূরা আল-আনফাল: ৬১]

তবে শর্ত হলো ঐ সন্ধি বা শান্তিচুক্তি এমন না হওয়া, যাতে শত্রুর জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং মুসলিমদের জন্য ক্ষতিকারক।

আর এগুলো হলো ইসলামের দৃষ্টিতে শরঈ যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলি এবং এগুলো হলো সেই যুদ্ধের সর্বোৎকৃষ্ট শর্তাবলি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

সুতরাং এসব শরঈ বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম শাসকগণের পক্ষ থেকে যখন যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে, (যার বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে) আর যখন তারা (মুসলিমগণ) তাদের থেকে যুদ্ধাদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটকাবে, তখন তাদেরকে তাদের (যুদ্ধবন্দীদের) সাথে আচার-আচরণের ক্ষেত্রে চারটি বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হবে:

- ক. কোনো বিনিময় ছাড়াই তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া, আর এটা হলো অনুগ্রহ বা অনুকম্পা।
- খ. বিনিময় গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া, আর এটা হলো মুক্তিপণ।
- গ. হত্যা করা।
- ঘ. দাস হিসেবে গ্রহণ করা।

□ অনুগ্রহ ও মুক্তিপণ (প্রথম দুটি) গ্রহণের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে আল্লাহ তা‘আলার বাণীর কারণে। তিনি বলেছেন,

﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ [محمد: ৬]

“তারপর হয় অনুকম্পা, নয় মুক্তিপণ। যতক্ষণ না যুদ্ধের ভার (অস্ত্র) নামিয়ে না ফেলে।” [সূরা মুহাম্মাদ: ৪]

□ আর হত্যা করার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীর কারণে, যেখানে তিনি বলেছেন,

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ ۚ حَتَّىٰ يُفْخِرَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ৬৭]

“কোনো নবীর জন্য সংগত নয় যে, তার নিকট যুদ্ধবন্দী থাকবে, যতক্ষণ না তিনি যমীনে (তাদের) রক্ত প্রবাহিত করেন।” [সূরা আল-আনফাল: ৬৭]

□ দাস-দাসী বানানোর বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে সুন্নাহ’র মধ্যে। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো যুদ্ধে নারী ও শিশুদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, যেমন তিনি বনু কুরাইযার যুদ্ধে নারী ও তাদের সন্তানদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করেছেন।

আর এর ওপর ভিত্তি করে মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতার জন্য সাধারণ ক্ষমতা থাকবে যে, সে পছন্দ বা নির্বাচন করবে: অনুকম্পা, অথবা মুক্তিপণ, কিংবা হত্যা করা, বা দাস-দাসী বানানো।

আর তার জন্য অধিকার থাকবে যে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের বিদ্যমান অবস্থার দুর্বলতা অথবা শক্তিমত্তার প্রতি নজর দিবেন এবং তার জন্য এই অধিকার থাকবে যে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি মুসলিম যুদ্ধবন্দীদের সাথে শত্রুদের আচরণের বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য করবেন, যাতে তিনি তাদের (শত্রুদের) যুদ্ধবন্দীদের সাথে মূলনীতির ভিত্তিতে আচরণ করতে পারেন; আর (শত্রুর সাথে) আচার-আচরণের মূলনীতি হলো তাদের আচরণের অনুরূপ আচরণ করা, যে নীতি আল-কুরআনুল কারীম প্রণয়ন করেছে, যখন তিনি বলেছেন,

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ৬০]

“আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ।” [সূরা আশ-শুরা: ৪০]

অনুরূপভাবে তার অধিকার রয়েছে, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অনুকম্পা ও মুক্তিপণের বুনিয়াদের ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধবন্দীদের সাথে

আচরণের ব্যাপারে ইসলামী উদারতার দিকে লক্ষ্য করবেন, যাতে তিনি শক্তি-সামর্থ্য থাকার পরেও (প্রতিশোধ না নিয়ে) মহানুভবতা প্রদর্শন ও ক্ষমার ব্যাপারে শত্রুদেরকে মহান শিক্ষা দান করতে পারেন, যেমনটি করেছেন ‘সালাহুদ্দীন আইয়ুবী’ যখন তিনি হিভিনের সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধে খ্রিষ্টানদের ওপর জয় লাভ করার পর যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ও মুক্তিপণ গ্রহণ করার মাধ্যমে অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন। তিনি যদি তাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করতেন, তাহলে এটাই হতো সম-আচরণের নীতিমালায় ন্যায় ও ইনসারফপূর্ণ; কারণ খ্রিষ্টানরা প্রথম ক্রুশের যুদ্ধে একদিনে সত্তর হাজারেরও বেশি মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করেছে। আল্লাহ ওই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন যিনি বলেছেন,

مَلَكْنَا فَكَانَ الْعَفْوُ مِنَّا سَجِيَّةً
فَلَمَّا مَلَكَتُمْ سَالَ بِالْدِّمِ أَبْطَحُ
وَحَلَلْتُمْ قَتْلَ الْأَسْرَى وَظَالَمًا
عَدَوْنَا عَنِ الْأَسْرَى نَعِيفُ وَنَضْفَحُ
فَحَسْبُكُمْ هَذَا الْقَارُؤُ بَيْنَنَا
وَكُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِي فِيهِ يَنْضَحُ

“আমরা যখন ক্ষমতা লাভ করেছি, তখন ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন ছিল আমাদের নীতি ও স্বভাব।

আর যখন তোমরা ক্ষমতা লাভ করেছ, তখন রক্তে সয়লাব হয়েছে উপাত্যকা।

আর তোমরা যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করাকে বৈধ করে নিয়েছ, অথচ যত বার আমাদের সকাল হয়েছে যুদ্ধবন্দীদের ওপর, আমরা অনুকম্পা ও ক্ষমা প্রদর্শন করেছি তত বার।

সুতরাং এটাই আমাদের ও তোমাদের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ে যথেষ্ট। বস্তুত প্রত্যেকটি পাত্র তাই প্রদান করে যা তাতে রক্ষিত আছে।”

আমাদের পর্যালোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতার জন্য যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচার-আচরণ ও লেনদেনের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ও ক্ষমতা রয়েছে: অনুকম্পা প্রদর্শন, অথবা মুক্তিপণ আদায়, অথবা হত্যা করা, কিংবা দাস-দাসী বানানো (এই চারটি বিকল্প বিষয়) থেকে যে বিষয়টিতে কল্যাণ আছে বলে তিনি মনে করবেন, তিনি তাই করতে পারবেন।

সুতরাং যখন মুসলিমদের নেতা মনে করবেন বর্তমানে দাস-দাসী বানানোর শরণাপন্ন হওয়ার দরকার নেই; কারণ বর্তমান বিশ্বে দাস-দাসী নিষিদ্ধ। তাছাড়া ইসলামের সাধারণ লক্ষ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো দাসদেরকে আযাদ করে দেওয়া এবং তাদেরকে স্বাধীনতা দান করা। অনুরূপভাবে অনুকম্পা প্রদর্শন ও মুক্তিপণ আদায়ের বুনিয়াদের ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে মহানুভবতার কুরআনিক নির্দেশ সংক্রান্ত নীতি গ্রহণের জন্য...তখন তিনি তার সামর্থ্যের আলোকে দাসত্বকে বাদ দিয়ে অপর যেকোনো একটিকে বাছাই করবেন, যাতে যুদ্ধের ভার (অস্ত্র) নামিয়ে ফেলার পর আমাদের হাতে আসা যুদ্ধবন্দীদের ওপর তিনি সমাধানমূলক সিদ্ধান্ত পেশ করতে পারেন।

আর এটাই করেছেন উসমানী খলিফা সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ, যখন তিনি যুদ্ধের ক্ষেত্রে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী না বানানোর ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় সন্ধি-চুক্তিতে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন; আর ওই সময় থেকেই রাষ্ট্রসমূহ এ পরিভাষা সম্পর্কে অবগত হয় এবং যুদ্ধের মধ্যে দাস-দাসী বানানোর প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে যায়!!

তবে এর অর্থ এই নয় যে, দাসপ্রথা চূড়ান্তভাবে বাতিল হয়ে গেছে এবং শরঈভাবে সেই অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে, যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে থাকে, বরং এর অর্থ হলো যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে শাসক তার ক্ষমতাকে প্রয়োগ করেছে তার দাস-দাসী বানানোর

ইচ্ছার উপরে অনুকম্পা প্রদর্শন ও মুক্তিপণ আদায়ের ইচ্ছা গ্রহণের দ্বারা যা ইসলামী রাজনীতির অনবদ্য অংশ।

আবার কখনও কখনও এমন দিন আসতে পারে, যেদিন বিশ্বে সামাজিক শাসন প্রণালী আবারও নতুন করে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী বানানো বৈধ করার দাবি উত্থাপন করতে পারে। অবস্থা যখন এমন দাঁড়াবে তখন ইসলাম এ নতুন ঘটনা ও আন্তর্জাতিক বৈধতার নীতির সামনে তার দু'হাত বাঁধা অবস্থায় থমকে দাঁড়িয়ে থাকবে (আবার যুদ্ধ-বন্দী নীতি গ্রহণ করবে না) এটা কোনো বিবেকবান মেনে নিতে পারে না। বরং পরিস্থিতি অনুযায়ী ইসলামকেও সে অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে; আর কোনো সন্দেহ নেই—তখন পারস্পরিক আচার-আচরণ ও লেনদেনটি হবে সমানে সমান বা অনুরূপ।

সারকথা:

ইসলাম প্রাচীনকালের দাসত্বের উৎস্বলসমূহ সামগ্রিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে তবে একটি মাত্র উৎস ছাড়া, আর তা হলো শরীয়তসম্মত যুদ্ধে বন্দী হওয়া যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করার উৎস, যখন মুসলিমদের শাসক এই দাস-দাসী বানানোর মধ্যে কল্যাণ আছে বলে মনে করেন।

আর শাসকের জন্য সুযোগ বা অধিকার রয়েছে যে, তিনি (যুদ্ধবন্দীদেরকে) দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করার পরিবর্তে অনুকম্পা প্রদর্শন অথবা মুক্তিপণ গ্রহণের নীতি অনুসরণ করতে পারবেন, যখন যুদ্ধসমূহে দাস-দাসী বানানোর প্রথাকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে বিশ্ব সন্ধি-চুক্তি করবে, যে কাজটি করেছেন উসমানী সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতেহ। তিনি তা করেছিলেন এই বিবেচনায় যে, ইসলাম তাকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচার-আচরণ ও লেনদেনের ব্যাপারে চারটি বিষয়ে সুযোগ দান করেছে: অনুকম্পা প্রদর্শন, অথবা মুক্তিপণ আদায় করা, অথবা হত্যা করা, কিংবা দাস-দাসী বানানো।

সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ইসলাম, মুসলিম ও সমস্ত মানবতার কল্যাণের দিক বিবেচনা করে এর মধ্য থেকে যেকোনো একটিকে নির্বাচন করার এখতিয়ার রাখেন।

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

==O==



দাস-দাসীর সাথে ইসলাম কেমন আচরণ করে?

বিশ্বে সামাজিক নিয়মনীতি ও শাসন ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে একটি শাসননীতিও পাওয়া যায়নি, যা ইসলাম যেমন করে আচরণ করেছে, তার মতো করে দাস-দাসীর সাথে মানবতাসুলভ সম্মানজনক আচার-আচরণ করেছে।

আমরা দাস-দাসীর সাথে এই আচার-আচরণ ও লেনদেনকে ইসলামী শাসনব্যবস্থার ছায়াতলে তিনটি মৌলিক ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারি।

প্রথম ধারা: দাস-দাসীকে মানব সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা, যার সম্মান পাওয়ার ও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

দ্বিতীয় ধারা: অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে মানব জাতির মধ্যে দাস-দাসীকে সমান বলে গণ্য করা।

তৃতীয় ধারা: দাস-দাসীর সাথে মানবতাসুলভ আচরণ করা, বিশেষ করে জনগণের সাথে তার মেলামেশার ক্ষেত্রে তাকে মানুষ বলে মনে করা।

□ দাস-দাসীকে মানব সৃষ্টি বলে বিবেচনা করা, যার সম্মান পাওয়ার ও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে—এই ধারার সাথে সম্পর্কিত হলো:

যখন ইসলামের আগমন ঘটে, তখন সমাজের প্রচলিত জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য এবং সামাজিক শ্রেণি ও বংশমর্যাদার বৈষম্য দূর করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইসলাম মানবজাতির উৎপত্তিস্থল, মূল শিকড় এবং শেষ পরিণতি বা প্রত্যাবর্তনস্থল যে একই—এই চিরন্তন সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তার আগমন হয়েছে একথা বলার জন্য (যেমন আব্বাহ বলেন):

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]

“হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশি মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়াবান।” [সূরা আল-হজুরাত: ১৩]

ইসলামের আগমন ঘটেছে রিসালাতের অধিকারী মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাষায় একথা পরিষ্কার করার জন্য যে, দাসের ওপর মনিবের, কৃষগঙ্গের ওপর শ্বেতগঙ্গের এবং অনারবের ওপর আরবের তাকওয়ার মানদণ্ড ব্যতীত অন্য কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

ইমাম মুসলিম ও তাবারী রাহিমাহুমা ল্লাহ বিদায় হজে মিনা ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে যারা শুনেছেন, তাদের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি মানুষের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন,

«أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، وَإِنَّهُ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَبِيٍّ، وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ»

“তোমরা আদমের সন্তান, আর আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। আর তাকওয়ার (আল্লাহকে ভয় করার) মানদণ্ড ব্যতীত অনারবের ওপর আরবের, আরবের ওপর অনারবের, শ্বেতগঙ্গের ওপর কৃষগঙ্গের এবং কৃষগঙ্গের ওপর শ্বেতগঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।”

এসব বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থার ছায়াতলে দাস-দাসী হলো এমন এক সৃষ্ট জীব, যার জন্য সম্মান পাওয়ার ও বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে অপর যেকোনো মানুষের মতো সমানভাবে। সুতরাং যখন তার জাতীয়তা ও মান-মর্যাদা সমুন্নত

হয়েছে, তখন তার মাঝে এবং অন্য কোনো মানুষের মাঝে তাকওয়া ও সংকাজ ব্যতীত অন্য কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

❑ অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে মানবজাতির মধ্যে দাস-দাসীকে সমান বলে গণ্য করা—এ ধারার সাথে সম্পর্কিত হলো:

ইসলাম দাস-দাসী ও অপর যেকোনো মানুষের মধ্যে যাবতীয় অধিকার ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে সমতা বিধান করেছে, তবে কিছু কিছু বিশেষ অবস্থা থেকে দাস-দাসীকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্বের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে ইসলাম অব্যাহতি দান করেছে। যেমন জুম‘আর সালাত ও হজের বাধ্যবাধকতা অব্যাহতি দান।

আর ইসলাম দাসদের জন্য যে সমতা দান করেছে, তার নীতি নির্ধারণের ওপর ভিত্তি করে (বলা যায়):

- ইসলাম তাদের জন্য সাধারণ শাস্তি ও শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তিসমূহের ক্ষেত্রে সমতার নীতি নির্ধারণ করেছে। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, সামুরা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَا، وَمَنْ جَدَّعَ عَبْدَهُ جَدَّعْنَاهُ، وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ»

“যে ব্যক্তি তার দাসকে হত্যা করবে, আমরা তাকে হত্যা করব; যে ব্যক্তি তার দাসের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কতন করবে, আমরা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কতন করব এবং যে ব্যক্তি তার দাসকে নপুংসক করবে, আমরা তাকে নপুংসক করব।”^(৩)

৩ আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৪৫১৫; তিরমিযী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ১৪১৪; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ২০১৯৭, ২০১৯৮।

এমন কি জেনে রাখা দরকার যে, ইসলাম দাসদের ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তিকে হালকা করে দিয়েছে। ফলে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও মানবিক দিক বিবেচনা করে দাসের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে স্বাধীন ব্যক্তির শাস্তির অর্ধেক।

- ইসলাম দাসদের জন্য ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অর্থবহ ও অতি উৎকৃষ্ট ধরনের নীতি নির্ধারণ করেছে। সুতরাং তারা মনিবদের সাথে পরস্পর ভাই ভাই, একে অপরকে মহব্বতকারী ও পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বিশুদ্ধ ও ধারাবাহিক সনদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

«إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا لَا يُطِيقُونَهُ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

“তোমাদের দাসরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন তাকে নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে, তাকে তা-ই পরায়। আর তাদের ওপর এমন কোনো কাজ চাপিয়ে দিও না, যা করার সামর্থ্য তাদের নেই। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সাহায্য করবে।”^(৪)

- ইসলাম দাস-দাসীর জন্য পরকালীন সওয়াবের নীতি নির্ধারণ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা স্বাধীন ব্যক্তিদের জন্য যে জান্নাত ও স্থায়ী নিয়ামতের ব্যবস্থা করেছেন, তারাও স্বাধীন ব্যক্তিদের মতো তার অধিকারী হতে পারবে, যদি তারা ঈমানের ওপর অটল থাকতে পারে এবং সৎ কাজ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

৪. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৩০।

﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [غافر: ٤٠]

“আর যে পুরুষ কিংবা নারী মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে তবে তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেওয়া হবে অগণিত রিযিক।” [সূরা গাফের: ৪০]

আর আয়াতের মধ্যকার শব্দগুলো ব্যাপক অর্থে সকল পুরুষ ও নারীর জন্য, চাই তারা দাস হোক কিংবা স্বাধীন, দরিদ্র হোক অথবা সম্পদশালী।

- ইসলাম দাস-দাসীর জন্য মানবিক মর্যাদা দানের নীতি নির্ধারণ করেছে। সুতরাং মানুষের মূল ইউনিট (একক) হিসেবে তারা স্বাধীন ব্যক্তিদের মতো। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ..﴾ [النساء: ২০]

“আর তোমাদের মধ্যে কারো মুক্ত ঈমানদার নারী বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান...” [সূরা আন-নিসা: ২৫]

আয়াতটি যে ব্যক্তি স্বাধীন ঈমানদার নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সেই ব্যক্তির জন্য মুমিন দাসীকে বিয়ে করার বৈধতা দানের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আয়াতটি স্বীকৃতি দিয়েছে যে, স্বাধীন নারী ও দাসীর সাথে আযাদ পুরুষ ও দাসদের মধ্য থেকে যাদের বিয়ে হবে, তারা একে অপরের অংশ এবং তাদের মধ্যে বংশের মূল শিকড়, উৎপত্তিস্থল ও প্রত্যাবর্তনস্থল এক হওয়ার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই।

ইসলাম দাস-দাসী ও মনিবদের মধ্যে যে পূর্ণাঙ্গ মানবিক সমতার দর্শন প্রতিষ্ঠা করেছে, এসব নীতিমালা তারই স্পষ্ট দলিল। প্রকৃতপক্ষে, এ নীতিগুলো এমন এক স্থায়ী ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থার রূপরেখা, যার ধারেকাছেও যুগ যুগ ধরে মানুষ রচিত কোনো নিয়মকানু কিংবা বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থা পৌঁছাতে পারেনি—যা ঐতিহাসিকভাবেই প্রমাণিত। অতএব, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলাম এক চিরন্তন ও বাস্তবমুখী জীবনব্যবস্থা, যা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে।

□ দাস-দাসীর সাথে মানবতাসুলভ ও সম্মানজনক আচরণ করা—এ ধারার সাথে সম্পর্কিত হলো:

ইসলামী শরীয়ত দাস-দাসীদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা ও তাদের প্রতি সুআচরণ নিশ্চিত করতে বিশেষ উপদেশমালা ও শিক্ষার রূপরেখা নির্ধারণ করেছে, যা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি ঐতিহাসিক গৌরবের বিষয়। এ সম্পর্কিত মূল নির্দেশনাসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

- মনিব নিজে যা খাবে, তার অধীনস্থকেও তা-ই খাওয়াবে এবং নিজে যা পরিধান করবে, তাকেও তা-ই পরতে দিবে। কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা হাদীস উল্লেখ করেছি (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন):

«فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسَهُ مِمَّا يَلْبَسُ»

“যার ভাই তার অধীনে থাকবে, সে যেন তাকে নিজে যা খায় তাকে তা-ই খাওয়ায় এবং নিজে যা পরে, তাকে তা-ই পরায়।”^(৫)

- মনিব তার দাস-দাসীদের ওপর ওপর এমন কোনো কাজ চাপিয়ে দিবে না, যা করার সামর্থ্য তার নেই। পূর্বে আমরা এই হাদীসটিও উল্লেখ করেছি (নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন):

৫. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৩০।

«وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ مَا لَا يُطِيقُونَهُ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ»

“আর তাদের ওপর এমন কোনো কাজ চাপিয়ে দিও না, যা করার সামর্থ্য তাদের নেই। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে দাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সাহায্য করবে।” (৬)

- দাস-দাসীকে এমনভাবে সম্বোধন করা, যাতে সে অনুভব করে যে, সে তার পরিবার-পরিজন ও আপনজনদের মধ্যেই আছে: বিশুদ্ধ হাদীসের ভাষ্য যা বলে:

«لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: هَذَا عَبْدِي، وَهَذِهِ أَمَّتِي، بَلْ لِيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي»

“তোমাদের কেউ যেন না বলে: এটা আমার দাস এবং এটা আমার দাসী; বরং সে যেন বলে: আমার যুবক ও আমার যুবতী।”

- অধীনস্থ দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ বিবাহের আশ্রয় প্রকাশ করলে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর সাথে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া; কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

«وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...» [النساء: ২০]

“আর তোমাদের মধ্যে কারো মুক্ত ঈমানদার নারী বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান। কাজেই তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দিবে ন্যায়সঙ্গতভাবে।” [সূরা আন-নিসা: ২৫]

- দাস-দাসীর সাথে এমন আচরণ করা, যেমনিভাবে কোনো মুসলিম তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে আচার-আচরণ ও লেনদেন করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿...وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ৩৬]

“আর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।” [সূরা আন-নিসা: ৩৬]

- দাসত্ব মোচনে কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। অচিরেই সামনের আলোচনায় এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ আসছে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী শরীয়তে দাস-দাসীর সাথে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার প্রসঙ্গে এসেছে যে, ইসলাম দাসকে তার মনিবের পক্ষ থেকে অশোভনীয়ভাবে শুধু চড় মারার কারণে বিধি মোতাবেক মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, যেমনটি অচিরেই দাসত্ব থেকে দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেওয়ার প্রাসঙ্গিক আলোচনা আসবে।

এমনকি ইসলামে ভালো ব্যবহার এবং দাসের মানবিক মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক আশ্চর্যজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল। যেমন,

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সংখ্যক দাস এবং কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় কিছু স্বাধীন ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন:

তিনি বিলাল ইবন রাবাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও খালিদ ইবন রুওয়াইহা আল-খাস‘আমী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মध्ये ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন।

আরও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন য়ায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও তাঁর চাচা হামযা ইবন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মাঝে।

তিনি য়ায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মध्येও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন।

এসব ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রকৃত অর্থে রক্তের বন্ধন ও বংশের সম্পর্কের মতো ছিল এবং তা মিরাসের (উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ) মध्ये शामिल করার পর্যায়ে উপনিহিত হয়েছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল এখানেই ক্ষান্ত হননি...

- বরং তিনি তাঁর ফুফুর কন্যা (ফুফাতো বোন) যয়নাব বিনতে জাহাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে তাঁর দাস যায়েদ ইবন হারিসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন!!

আর বিয়ের প্রসঙ্গটি খুবই সংবেদনশীল, বিশেষ করে নারীর পক্ষ থেকে; কেননা সে তার চেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি হয়, কিন্তু তার স্বামী তার চেয়ে বংশগত ও সম্পদের দিক থেকে নীচু মানের হওয়াকে সে মেনে নেয় না। সে অনুভব করে যে, এটা তার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে এবং তার গৌরবকে নীচু বা খাট করে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল এসব কিছুর চেয়ে আরও অধিক উচ্চাঙ্গের ও তাৎপর্যপূর্ণ। আর তা হলো দাসী-দাসীকে ঐ গর্ত থেকে উঠিয়ে আরবের কুরাইশ বংশের নেতৃবৃন্দের চেয়েও উচ্চমানে নিয়ে আসা, যে গর্তে অত্যাচারী মানবগোষ্ঠী তাকে ঠেলে দিয়েছে। বরং তাঁর লক্ষ্য ছিল জাহেলী সমাজ থেকে জাহেলী জাতীয়তাবাদ বা স্বজনপ্রীতির মূলোৎপাটন করা এবং আরব জাতি থেকে বংশ নিয়ে অহংকার করার মতো পচন বা ক্ষত দূর করা।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল এখানেই ক্ষান্ত হননি...

- বরং তিনি 'মুতা যুদ্ধে' তাঁর দাস যায়েদকে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীর সামনে প্রেরণ করেছিলেন, যে বাহিনীতে ছিলেন আনসার ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মুহাজিরগণ; আর তিনি তার (যায়েদের) পুত্র 'উসামা ইবন যায়েদ'কে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়েছিলেন, আর তার নেতৃত্বের অধীনে ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই উজির (মন্ত্রী) ও তাঁর পরবর্তী কালের দুই খলিফা আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা। সুতরাং তিনি এর দ্বারা দাসকে শুধু মানবিক সমতাই দান করেননি, বরং তাকে স্বাধীন ব্যক্তিদের ওপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকার দান করেছেন। আর এই ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে, যে প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ ধারাবাহিক বিশুদ্ধ সনদে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

«اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ» (ما أقام فيكم كتاب الله تبارك وتعالى)

“যদি তোমাদের ওপর এরূপ কোনো হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, যার মাথাটি কিসমিসের মতো, তবুও তোমরা তার কথা শোন এবং তার আনুগত্য কর (যতক্ষণ সে তোমাদের মাঝে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার কিতাবের বিধান প্রতিষ্ঠিত রাখে)।”^(৭)

সুতরাং এর দ্বারা তিনি দাসদেরকে (যোগ্যতার ভিত্তিতে) সকল উচ্চপদের অধিকার দান করেছেন, আর তা হলো মুসলিমগণের খিলাফত, যতক্ষণ সে তার জন্য যোগ্য ও লাগসই হবে। আর উমার ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু খলিফা নিয়োগ করার সময় বলেন,

«وَلَوْ كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حَذِيفَةَ حَيًّا لَوَلَّيْتُهُ»

“আবু হুযায়ফার দাস সালেম যদি জীবিত থাকত, তাহলে আমি তাকে শাসক নিয়োগ করতাম।” সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নীতি প্রণয়ন করেছেন, উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ঠিক সেই নীতির ওপরই পরিভ্রমণ করেন!!

নিঃসন্দেহে ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরবর্তীতে তাঁর খোলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষ থেকে এই হস্তক্ষেপের কল্যাণে তা দাস-দাসীদের মান-মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে, বংশগত গৌরবের দাবিকে মূলোৎপাটন করেছে এবং তা পদসমূহকে তাদের বংশগত অথবা জাতিগত অথবা বর্ণগত দিকে ভ্রক্ষেপ না করে যোগ্যতার

৭. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ৭১৪২।

বিচারে শক্তিশালী ব্যক্তিদের সাথে সম্পৃক্ত করেছে...। আর এই বিষয়টিকে আরও বেশি মজবুত ও সুদৃঢ় করে যখন মুনাফিকদের কেউ কেউ ‘উসামা ইবন যায়েদ’-এর নেতৃত্বকে প্রশংসিত করেছিল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন:

«إِنْ يَطْعُنُوا بِإِمَارَةِ أُسَامَةَ فَقَدْ طَعْنُوا بِإِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ؛ فَوَاللَّهِ إِنَّ أُسَامَةَ لَجَدِيرٌ بِالْإِمَارَةِ كَمَا أَنَّ أَبَاهُ لَجَدِيرٌ بِهَا».

“তারা যদি উসামার নেতৃত্বকে প্রশংসিত করে থাকে, তাহলে তারা ইতঃপূর্বে তাঁর পিতার নেতৃত্বকেও প্রশংসিত করেছিল। আল্লাহর কসম! নিশ্চয় উসামা নেতৃত্বের উপযুক্ত, যেমনিভাবে তাঁর পিতাও তার উপযুক্ত।”

==O==

দাস-দাসীদের সঙ্গে সুব্যবহার, সম্মান প্রদর্শন ও ইহসান করার ক্ষেত্রে ইসলাম যেসব নীতিমালা, নির্দেশাবলি ও দৃষ্টান্ত প্রবর্তন করেছে, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল (যেমনটি খুব শীঘ্রই দাস-দাসী মুক্ত করার পয়েন্টে আসবে) দাস-দাসীর ব্যাপারে ঘোষণা করা যে, নিশ্চয় সে অস্তিত্বসম্পন্ন, সম্মান ও মানবতার অধিকারী মানুষ, এমনকি যখন সে তার বিদ্যমান অস্তিত্ব থেকে অনুভব করবে যে, তার সম্মান পাওয়ার ও বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তখন সে তার স্বাধীনতা দাবি করবে, বরং সে দাসত্ব ও গোলামী থেকে স্বাধীনতা অর্জন করা পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভের পথে পথ চলবে, এমনকি চেষ্টার শেষ ধাপে গিয়ে স্বাধীন ব্যক্তিদের একজন হয়ে যাবে!!

ইসলামের আগে ও পরে অপরাপর জাতিসমূহের মধ্যে দাস-দাসীর সাথে স্বৈরাচার যালিম কর্তৃক আচার-ব্যবহারের মধ্যে এই বিষয়গুলো কোথায়, যেখানে তারা দাস-দাসীকে মর্যাদাবান ও সৌভাগ্যবান জাতি ভিন্ন অন্য কোনো জাতি বলে বিবেচনা করত, বরং তার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে গোলামী ও দাসত্ব করার জন্য। আর শরীফ অথবা মনিব কিংবা ধনী ব্যক্তির জন্য বশীভূত হয়ে থাকার জন্য?

আর সেখান থেকেই তাদের অন্তরসমূহ কখনও তাকে হত্যা করাকে, শাস্তি দেওয়াকে, তাকে আগুন দ্বারা সেক দেওয়াকে এবং তাকে অতি কষ্টকর ও নোংরা কাজে বাধ্য করাকে অপরাধ বা পাপ মনে করে না!!

==O==



ইসলাম কীভাবে দাস-দাসীকে মুক্তি দিয়েছে?

ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলাম যখন দাস-দাসীর মান সমুল্লত করা, তার সাথে উত্তম ব্যবহার করা, তাকে সম্মান করা এবং তার প্রতি ইহসান করার ব্যাপারে নিয়মনীতি ও নির্দেশমালা প্রণয়ন করেছে, তখন তার উদ্দেশ্য ছিল দাস-দাসীর মানবিক অস্তিত্ব ও সম্মানকে অনুভব করা, এমনকি যখন সে বাস্তবে তার এই অস্তিত্ব বা অবস্থানকে অনুভব করবে এবং এই সম্মানের বাস্তবতা উপভোগ করবে, তখন সে দাসত্ব থেকে তাকে মুক্ত করার আবেদন করবে এবং মুক্ত করার পথে পথ চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণে সে পূর্ণ স্বাধীনতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হবে।

এর অর্থ হলো, ইসলাম কর্তৃক দাস-দাসীকে মুক্ত করার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রণীত শরঈ নিয়মনীতির মাধ্যমে কার্যত দাস-দাসীকে মুক্ত করার পূর্বে তাকে মনের ভেতর ও হৃদয়ের গভীরতা থেকে মুক্ত করে দিয়েছে, যাতে সে তার অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারে এবং যথার্থতা ও বলিষ্ঠতার সাথে স্বাধীনতা দাবি করতে পারে। আর এটাই হলো স্বাধীনতার প্রকৃত গ্যারান্টি!!

বস্তুত আদেশ বা ফরমান জারি করার মাধ্যমে দাস-দাসী মুক্ত করার দ্বারা আসলেই দাস-দাসীর মুক্তি অর্জিত হয়নি। আর আমরা যা বলি, তার পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো ‘আব্রাহাম লিংকন’ এর হাতের কলমের নির্দেশ (লেখার) দ্বারা দাস-দাসী মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে আমেরিকান অভিজ্ঞতা; কারণ বাহ্যিকভাবে আইনের দ্বারা লিংকন যেসব দাসদেরকে মুক্ত করে দিয়েছিল, তারা স্বাধীন হতে পারেনি এবং ভেতরে ভেতরে তারা তাদের মনিবদের কাছেই ফিরে এসেছে—পরবর্তীতেও তারা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি!! কেন?

কেননা চিরস্থায়ী দাসত্বের ছায়াতলে তাদের জীবন তার মানসিক ও অনুভূতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে এসব অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শুরু করে; ফলে আনুগত্য ও বশ্যতার প্রক্রিয়া চূড়ান্তভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং চূড়ান্তভাবে অস্তিত্বগত ও সম্মানবোধকে দুর্বল করে ফেলে!!

আর আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ও মানবরচিত বিধানের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত শাসনব্যবস্থা হলো এমন, যা মানুষকে স্বাধীনতা লাভে অনুপ্রাণিত করে এবং তা লাভের জন্য উপায়সমূহ ঠিক করে দেয়। অতঃপর তাদেরকে তা প্রদান করে ঐ মুহূর্তে, যখন তারা নিজেরাই তা দাবি করে। অপরদিকে মানব রচিত শাসনব্যবস্থা হলো এমন, যা বিষয় বা ব্যাপারসমূহকে জটিলতা ও সংকটের দিকে ঠেলে দেয়, শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়, যেখানে শত শত ও হাজার হাজার প্রাণহানি ঘটে। অতঃপর তা স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীকে অপছন্দনীয় বাধ্যবাধকতা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না!!

আর দাস-দাসীর প্রশ্নে ইসলামের অন্যতম মহান বৈশিষ্ট্য হলো, সে প্রকৃত স্বাধীনতার ব্যাপারে তাকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে অনুপ্রাণিত করে।

অভ্যন্তরীণ দিক হলো: স্বাধীনতার মত নিয়ামত সম্পর্কে এবং যেকোনো মূল্যে তা পাওয়ার জন্য চেষ্টা-সাধনার ব্যাপারে খুব গভীর থেকে তার অনুভূতি জাগ্রত করা।

আর বাহ্যিক দিক হলো: এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শরীয়তসম্মত উপায়সমূহ উদ্ভাবন করা।

এই অর্থে দাস-দাসী মুক্ত করার জন্য ভালো নিয়ত বা মানসিকতাকেই ইসলাম যথেষ্ট মনে করে না, যেমন কাজ করেছেন ‘আব্রাহাম লিংকন’ তিনি এমন আইন জারি করেছেন যে আইনের ব্যাপারে মানুষের অন্তরে কোনো আবেদন তৈরি হয়নি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মানব প্রকৃতির

ব্যাপারে ইসলামের উপলব্ধি ও বিচক্ষণতা কত গভীর। আর তাই ইসলাম তার সমস্যা নিরসনের ব্যাপারে সর্বোত্তম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

এর পাশাপাশি ইসলাম প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছে, তাকে যথার্থ লালন করেছে, সে হক ধারণ করার ও হকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে বহন করার যোগ্য করে গড়ে তুলেছে। এসবই করেছে ইসলাম সে হক বা অধিকার নিয়ে হানাহানি ও মারামারি পর্যায়ে যাওয়ার পূর্বেই। অথচ মধ্য যুগের ইউরোপে সে হানাহানি ও মারামারিই সংঘটিত হয়েছে। এটি এমন ঘৃণিত লড়াই, যা মানুষের অনুভূতি ভেঁতা করে দিয়েছে, জন্ম দিয়েছে হিংস-বিদ্বেষের। ফলে মানুষের জীবনের চলার পথে কল্যাণ লাভের যে সম্ভাবনা ছিল, সেসব সম্ভাবনাকে তা ধ্বংস করে দিয়েছে!!

দাস-দাসীকে মুক্ত করার জন্য মানসিকভাবে তৈরি করার বিষয়টির গুরুত্ব বুঝানোর এ দৃষ্টি আকর্ষণের পর আমি ফিরে যাচ্ছি বাহ্যিকভাবে দাস-দাসীকে মুক্ত করার ব্যাপারে শরঈ নিয়ম-কানুন বর্ণনার করার দিকে, যাতে ওই ব্যক্তি জানতে পারে, যে ব্যক্তি জানতে চায় যে, গোলামীর বন্দীদশা থেকে দাস-দাসীদের স্বাধীন ও মুক্ত করার ব্যাপারে ইসলামের একটি শরীয়তসম্মত ব্যবস্থাপনা বা পদ্ধতি রয়েছে।

দাস-দাসী মুক্ত করার ব্যাপারে ইসলাম যে শরীয়তসম্মত পদ্ধতি প্রণয়ন করেছে, তা নিম্নোক্ত পদ্ধতি বা ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে:

ক. উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি দান

খ. কাফ্ফারা প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি দান

গ. লিখিত চুক্তির মাধ্যমে মুক্তি দান

ঘ. রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে মুক্তি দান

ঙ. সন্তানের মা (উম্মুল ওয়ালাদ) হওয়ার কারণে মুক্তি দান

চ. নির্যাতনমূলক প্রহারের কারণে মুক্তি দান

উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি দান:

আর তা হলো, পুরস্কার ও সাওয়াব অর্জনের নিয়তে মনিবদের পক্ষ থেকে তাদের অধীনে থাকা দাস-দাসীদের মুক্ত করে দেওয়া, যাতে মুক্তি দানকারী ব্যক্তি জালাত পাওয়ার মাধ্যমে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে পারে। যেমন আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝﴾ [القمر: ৫৫]

“যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহাঅধিপতি (আল্লাহ)র সান্নিধ্যে।” [সূরা আল-কামার: ৫৫]

আর ইসলাম মনিবদেরকে দাস-দাসী মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ডভাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَلَا أَفْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكُنْ رَقَبَةً ۚ﴾ [البقرة: ১৭৬]

“তবে সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি। আর কিসে আপনাকে জানাবে যে, বন্ধুর গিরিপথ কী? এটা হচ্ছে দাসমুক্তি...।” [সূরা আল-বালাদ: ১১-১৩]

অন্যদিকে যেসব হাদীসে দাস-দাসী মুক্ত করার ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা এসেছে এবং দাস-দাসী মুক্তিদানকারী ব্যক্তির জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে, সেগুলোর সংখ্যা অনেক বেশি ও গণনার বাইরে। আমরা উদাহরণস্বরূপ তন্মধ্যে সাধ্যমত কিছু উপস্থাপন করেছি:

- ইবন জারির রাহিমাহুল্লাহ আবু নাজীহ রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَفَاءً كُلَّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهِ مِنَ النَّارِ؛ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَفَاءً كُلَّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِ مُحَرَّرِهَا مِنَ النَّارِ».

“যেকোনো মুসলিম পুরুষ কোনো মুসলিম পুরুষ (দাস)কে আযাদ করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার প্রত্যেকটি অস্থির বিনিময়ে তার এক একটি অস্থিকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। আর যেকোনো মুসলিম নারী কোনো মুসলিম দাসীকে আযাদ করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার প্রত্যেকটি অস্থির বিনিময়ে তার এক একটি অস্থিকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন।”^(৮)

- ইমাম আহমাদ রাহিমাল্লাহু ‘আমর ইবন ‘আনবাসা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا لِيُذْكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَعْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِدْيَتُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে যাতে আল্লাহ তা‘আলার যিকির (স্মরণ) করা হবে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো একজন মুসলিম দাসকে আযাদ করবে, তা জাহান্নাম থেকে বাঁচার

৮. আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৯৬৫; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৭০২২।

জন্য তার মুক্তিপণ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার পথে শুভ্রকেশী (বৃদ্ধ) হবে, তা তার জন্য কিয়ামতের দিনে আলো হবে।”^৯)

- ইমাম আবু দাউদ ও নাসায়ী রাহিমাহুমা ল্লাহু আমর ইবন আনবাসা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَصَا مِنْهَا عُصَا مِنْهُ مِنَ النَّارِ»

“যে ব্যক্তি একজন মুমিন দাসকে আযাদ করবে, আল্লাহ তা‘আলা সেই দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন থেকে তার প্রতিটি অঙ্গকে মুক্ত করবেন।”^(১০)

- ইমাম আহমাদ রাহিমাহু ল্লাহু বারা ইবন আযিব রাহিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَّمَنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْتَقِ النَّسَمَةَ، وَفَكَ الرَّقَبَةَ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوَلَيْسَتْ بَوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّ عَتَقَ النَّسَمَةَ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكَ الرَّقَبَةَ أَنْ تُعَيِّنَ فِي عِتْقِهَا».

“জনৈক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজের প্রশিক্ষণ দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি দাস-দাসী আযাদ কর এবং দাস মুক্ত কর। তারপর সে বলল: এই দুটি কাজই কি এক জাতীয় কাজ নয়? জবাবে তিনি বললেন: না। দাস-দাসী আযাদ করা

৯. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৯৪৪১।

১০. আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং ৩৯৬৪; নাসায়ী, আস-সুনান, হাদীস নং ৩১৪৫; ইবন আবি শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ, হাদীস নং ১২৬৩৩।

মানে হলো, তুমি তাকে মুক্ত করার মাধ্যমে পৃথক করে দিবে। আর দাস মুক্ত করা মানে হলো, তুমি তার মুক্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করবে।”^(১১)

- ইমাম বুখারী ও মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ সাঈদ ইবন মারজানা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى لَيَعْنُقَ بِأَلْيَدِ الْيَدِ، وَبِالرَّجْلِ الرَّجْلَ، وَبِالْفَرْجِ الْفَرْجَ...»

“যে ব্যক্তি একজন মুমিন দাসকে আযাদ করবে, আল্লাহ তা‘আলা সেই দাসের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন থেকে তার প্রতিটি অঙ্গকে মুক্ত করবেন, এমনকি তিনি হাতের বিনিময়ে হাত, পায়ের বিনিময়ে পা এবং গুণ্ডাঙ্গের বিনিময়ে গুণ্ডাঙ্গকে মুক্ত করবেন...”^(১২)

আলী ইবন হাসান রাহিমাহুল্লাহ হাদীসের বর্ণনাকারী সাঈদ ইবন মারজানা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তুমি কি হাদীসটি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট থেকে শুনেছ?

জবাবে সাঈদ ইবন মারজানা বললেন: হ্যাঁ।

অতঃপর আলী তাঁর এক দাসকে লক্ষ্য করে বললেন: তুমি ‘মুতাররিফ’ (তাঁর দাসদের একজন)কে ডাক।

সে যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন তিনি বললেন: যাও, তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে মুক্ত।

১১. আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৮৬৪৭।

১২. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৫০৯; আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৯৪৪১।

আর দাস-দাসী মুক্তি দাতাদের মর্যাদা প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত এসব দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মুসলিমগণ দাস-দাসীদের মুক্ত করার বিষয়টিকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের মনের আনন্দ দানকারী এবং চোখের প্রশান্তি দাতা হিসেবে গ্রহণ করেছে, যাতে তারা ওই দিন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর জাম্বাতের অধিকারী হতে পারে, যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে অতি উত্তম নমুনা বা আদর্শ পেশ করেছেন, যেহেতু তিনি তাঁর মালিকানায় থাকা সকল দাসকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করেছেন তাঁর সাহাবীগণ ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে এবং স্বপ্রণোদিত হয়ে।

আর আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মক্কার কুরাইশ নেতাদের নিকট থেকে দাসদের ক্রয় করার জন্য অনেক সম্পদ খরচ করেছেন, যাতে তিনি তাদেরকে মুক্ত করে দিতে পারেন এবং তাদেরকে দিতে পারেন পূর্ণ স্বাধীনতা।

আর ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একটি বিরাট সংখ্যক দাস-দাসীকে মুক্ত করা হয়েছে ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার লাভের আশায় স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে মুক্ত করার পদ্ধতিতে।

আর ইসলামের আগে ও পরে এই বিরাট সংখ্যক দাস-দাসীকে মুক্ত করার কোনো দৃষ্টান্ত মানবতার ইতিহাসে নেই, যেমনিভাবে তাদের মুক্তি দানের কার্যক্রম ছিল নিরেট ও নির্ভেজাল মানবতার প্রতীক, যা মানুষের হৃদয় ও ঈমান থেকে বেরিয়ে এসেছে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি ও তাঁর জাম্বাত ব্যতীত অন্য কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়!!

কাফ্ফারা প্রদানের মাধ্যমে মুক্তি দান:

দাস-দাসী মুক্ত করার ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত উপায়সমূহের মধ্যে এটা একটা অন্যতম মহান উপায়। আল-কুরআনুল কারীম কাফ্ফারাস্বরূপ দাস-দাসী মুক্ত করার জন্য অনেক বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেছে, শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড ও প্রকাশ্য এসব গুনাহের মধ্যে কোনো একটিতে মুসলিম ব্যক্তি জড়িয়ে গেলে (তার ওপর এ ধরনের কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে)।

অধিকাংশ অপরাধ ও শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড এমন, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন ও বাস্তব জীবনকে পরিবেষ্টন করে আছে!!

সুতরাং যখন দাস-দাসী মুক্ত করে দেওয়া হবে এসব অপরাধ ক্ষমার অন্যতম উপায়, তখন এর অর্থ হবে—ইসলামী সমাজে দাস-দাসীদের একটা বিরাট সংখ্যার মুক্তির ব্যাপারে ইসলাম দ্রুত কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে!!

আপনাদের সামনে আল-কুরআনুল কারীমের বক্তব্যের আলোকে কাফ্ফারার মাধ্যমে দাস-দাসী আযাদ করার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় তুলে ধরা হলো:

- ভুলবশত হত্যার কাফ্ফারা নির্ধারণ করা হয়েছে একজন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় করা; আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء:

[৭৫

“আর কেউ কোনো মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় করা কর্তব্য।” [সূরা আন-নিসা: ৯২]

- যদি এমন সম্প্রদায়ের কাউকে হত্যা করা হয়, যাদের সাথে আমরা পরস্পর অংগীকারাবদ্ধ, তবে সে ক্ষেত্রে হত্যার কাফ্যারা নির্ধারণ করা হয়েছে একজন দাস মুক্ত করা; আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
 ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ৭২]

“আর যদি সে এমন সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ আদায় করা এবং সাথে মুমিন দাস মুক্ত করা কর্তব্য।” [সূরা আন-নিসা: ৯২]

- ইচ্ছাকৃত শপথ ভঙ্গের কাফ্যারা নির্ধারণ করা হয়েছে একজন দাস মুক্ত করা; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,
 ﴿...وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُوهٗ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ...﴾ [المائدة: ৮৭]

“...কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছে করে কর, সেগুলোর জন্য তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। তারপর এর কাফ্যারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদেরকে খেতে দাও, বা তাদেরকে বস্ত্রদান, কিংবা একজন দাস মুক্তি...।” [সূরা আল-মায়িদা: ৮৯]

- যিহারের^{১৩} কাফ্যারা নির্ধারণ করা হয়েছে একজন দাস মুক্ত করা, যখন সে তার শব্দগুলো উচ্চারণ করবে, অতঃপর সেই কথা থেকে ফিরে আসবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,
 ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ...﴾ [المجادلة: ৩]

১৩. যিহার (الظهار) হলো: স্বামী কর্তৃক তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলা: “তুমি আমার ওপর আমার মায়ের পিঠের মতো হারাম”। সুতরাং এই শব্দের কারণে তার ওপর তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে, যেমনিভাবে তার ওপর তার মা হারাম।

“আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অন্যকে স্পর্শ করার আগে একটি দাস মুক্ত করতে হবে...” [সূরা আল-মুজাদালা: ৩]

- রমাদান মাসে ইচ্ছাকৃত সাওম ভঙ্গের কাফফারা নির্ধারণ করা হয়েছে দাস মুক্ত করা, আর এটা সাব্যস্ত হয়েছে সহীহ সুন্নাহর মধ্যে।

এ ছাড়াও রয়েছে মুস্তাহাব বা ঐচ্ছিক দাসমুক্তি, যা একজন মুসলিম কুরআন মাজীদে নির্ধারিত ফরয কাফফারা ছাড়াও সংঘটিত অন্য যেকোনো গুনাহের কাফফারা হিসেবে আদায় করতে পারে। এর উদ্দেশ্য হলো যত বেশি সম্ভব ক্রীতদাসকে মুক্ত করা।

এখানে ‘ভুলবশত হত্যা’র কাফফারার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা সঙ্গত। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, এর কাফফারা হলো নিহতের পরিবারকে ‘রক্তপণ’ প্রদান করা এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করা। ভুলবশত নিহত ব্যক্তিটি এমন এক মানবাত্মা, যাকে তার পরিবার এবং সমাজ অন্যায়ভাবে হারিয়েছে।

এ কারণেই ইসলাম এর দুটি দিক থেকে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করেছে: নিহতের পরিবারকে রক্তপণ দেওয়ার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ, আর একজন মুমিন দাস মুক্ত করে সমাজের জন্য ক্ষতিপূরণ! যেন একজন দাসকে মুক্ত করা হলো সেই মানবাত্মাকে পুনরায় জীবিত করার নামান্তর, যা ভুলবশত হত্যার মাধ্যমে হারিয়ে গিয়েছিল।

ইসলামের দৃষ্টিতে দাসত্ব হলো মৃত্যু বা মৃত্যুরই অনুরূপ একটি অবস্থা—যদিও দাসদের জন্য ইসলাম অজস্র অধিকার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। এজন্যই ইসলাম দাস-দাসীদেরকে (সত্যিকারের) জীবন দানের জন্য তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।

==O==

লিখিত চুক্তির মাধ্যমে মুক্তি দান:

এটা দাস-দাসীর জন্য মুক্তি পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ, যখন সে নিজেই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হবে এবং সেই অর্থের ব্যাপারে দাস ও মনিব ঐকমত্য পোষণ করবে যে, দাস কিস্তিতে তা মনিবকে পরিশোধ করে দিবে; অতঃপর যখন সে তা পরিশোধ করবে, তখন সে স্বাধীন হয়ে যাবে; আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿...وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ...﴾ [النور: ৩৩]

“...আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান কর।” [সূরা আল-মায়িদা: ৮৯]

ফকীহগণের দুটি অভিমত:

দাস কর্তৃক মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির আবেদনে সাড়া দেওয়া মনিবের ওপর ওয়াজিব (আবশ্যিক) হবে কি?

প্রথম অভিমত: এই ধরনের আবেদনে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। আর এটাই হলো বিভিন্ন নগর ও শহরের আলেমদের মধ্যে অধিকাংশ ফকীহ’র অভিমত।

তাদের দলীল:

আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ “যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার” [সূরা আন-নূর: ৩৩] বাক্যটি স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে যে, আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ...﴾ “তবে তোমরা

তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও...” আয়াতের মধ্যকার ‘আমর’ বা নির্দেশটি ওয়াজিব থেকে মুস্তাহাবে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং যখন গোলাম তার মনিবকে বলবে: এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আপনি আমাকে মুক্ত করে দেওয়ার চুক্তিপত্রে সই করে দিন, আর মনিব যখন বলবে: তোমার মাঝে কোনো কল্যাণ আছে বলে আমার জানা নেই, তখন মনিবের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে; কারণ আমানতদারিতা ও সততার দিক থেকে তার দাসের ব্যাপারে তিনিই সবচেয়ে বেশি ভালো জানেন।

দ্বিতীয় অভিমত: মনিবের ওপর আবশ্যিক হলো দাস কর্তৃক তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির আবেদন করলে তা গ্রহণ করা এবং তার ওপর ওয়াজিব হলো যখন সে উভয়ের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত অর্থ আদায় করে দিবে তখন তাকে মুক্ত করে দেওয়া।

আর কুরতুবী’র বক্তব্য অনুযায়ী যারা এই অভিমতের প্রবক্তা, তারা হলেন: ইকরিমা, আতা, মাসরুক, আমর ইবন দীনার, দাহ্‌হাক ইবন মুযাহিম এবং আহলে যাওয়াহের এর মধ্যে একদল আলেম।

তারা উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর আমল বা কর্ম দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। ঘটনাটি হলো—সিরীন আবু মুহাম্মদ ইবন সিরীন আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির আবেদন করেছিলেন, আর তিনি (আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) ছিলেন তার মনিব (মাওলা)। অতঃপর আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন, ফলে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু দোররা উত্তোলন করে তাকে সতর্ক করলেন এবং আল্লাহ তা‘আলা’র বাণী তিলাওয়াত করলেন:

﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ৩৩]

“তাহলে তোমরা তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার।” [সূরা আন-নূর: ৩৩]

এরপর আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। অথচ উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এমন কোনো বিষয়ে আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর ওপর চাবুক উঠানোর লোক ছিলেন না, যা করা আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর জন্য নিছক ঐচ্ছিক বা জায়েয ছিল (বরং তিনি এটাকে ওয়াজিব মনে করেই চাবুক তুলেছিলেন)।

আর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টিকে আরও মজবুত করে নিম্নোক্ত আয়াতের শানে ন্যুল (আয়াত নাযিলের কারণ)।

﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...﴾

“মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে...” [সূরা আন-নূর: ৩৩]

কুরতুবীর বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতটি হুয়াইতিবের ‘সবীহ’ নামক দাসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। সে তার মনিবের নিকট তাকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য লিখিত চুক্তির আবেদন করে, কিন্তু ‘হুয়াইতিব’ সে আবেদন নামঞ্জুর করে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই আয়াতটি নাযিল করেন। তারপর হুয়াইতিব তাকে একশত দীনারের বিনিময়ে মুক্ত করে দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন এবং তাকে বিশ দীনার দান করলেন। অতঃপর ‘সবীহ’ তা পরিশোধ করলে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়।

ইসলাম কর্তৃক প্রবর্তিত কতগুলো বিধি-বিধানের মাধ্যমে দাসের ওপর ‘মুকাতাবা’ চুক্তিকে সহজ করে দেওয়া হয়েছে; তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নীতি হলো:

১. ইসলাম যাকাতের মাল থেকে ‘মুকাতিব’ দাসকে মুক্ত করার সুযোগ করে দিয়েছে; কেননা, আল্লাহ তা‘আলা সাধারণভাবে বলেছেন:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ... وَفِي الرِّقَابِ ...﴾ [التوبة: ৬০]

“সাদাকাহ তো শুধু ফকীরদের জন্য...এবং দাসমুক্তিতে...” [সূরা আত-তাওবা: ৬০]

২. দাস যে অর্থ মনিবকে প্রদান করবে, তা বিভিন্ন কিস্তিতে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে; কেননা ইমাম বুখারী ও আবু দাউদ রাহিমাহুমালাহ আয়েশা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

«جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى نَسْعٍ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ، أَوْقِيَّةٌ، فَأَعِينَنِي»

“বারীরা রাহিয়াল্লাহু ‘আনহা আমার কাছে এসে বলল, আমি আমার মালিক পক্ষের সাথে নয় উকিয়া দেওয়ার শর্তে ‘মুকাতাবা’ নামক দাস-দাসী আয়াদ করার লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি—প্রতি বছর যা থেকে এক উকিয়া করে দেওয়া হবে। তাই আপনি আমাকে (এ ব্যাপারে) সাহায্য করুন।”^(১৪)

৩. মনিবের ওপর কর্তব্য হলো তার দাসের মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি বাস্তবায়নের অর্থের যোগান দানে সহযোগিতা করা; যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনে তাকে এ ব্যাপারে নির্দেশ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

«...فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ» [النور:

[৩৩]

“...তাহলে তোমরা তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দান কর।” [সূরা আন-নূর: ৩৩]

১৪. বুখারী, আল-জামেউস সহীহ, হাদীস নং ২৭২৯।

সহযোগিতার দুটি পর্যায়:

- হয় সে (মনিব) তাকে তার হাতে যা আছে, তা থেকে কিছু প্রদান করবে।
- নতুবা সে চুক্তি মোতাবেক দাস কর্তৃক প্রদেয় অর্থ থেকে অংশবিশেষ ছাড় দিয়ে দিবে।

আর আলী রাহিয়াল্লাহ্ ‘আনহু চুক্তি মোতাবেক অর্থের এক-চতুর্থাংশ ছাড় দেওয়াকে উত্তম মনে করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাহিয়াল্লাহ্ ‘আনহু তার এক-তৃতীয়াংশ ছাড় দেওয়াকে উত্তম মনে করেছেন। আর এ ধরনের সহযোগিতাকে কেউ কেউ ওয়াজিব মনে করেন।

ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সহযোগিতার জন্য মনিবকে বাধ্য করা হবে; আর মনিব যদি মারা যায় এবং সে তার ‘মুকাতিব’ দাসকে আর্থিক সহযোগিতা না করে থাকে, তাহলে বিচারক তার ওয়ারিসদেরকে তাকে সহযোগিতার জন্য নির্দেশ প্রদান করবে।

৪. যখন দাস চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত অর্থ তার মনিবকে পরিশোধ করে দিবে, তখন সে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্ত হয়ে যাবে এবং মনিব কর্তৃক আযাদ বা মুক্ত করার অর্থবোধক কোনো শব্দ উচ্চারণের প্রয়োজন হবে না।
৫. কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসীরে পূর্ববর্তী কোনো কোনো আলেমের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন: যখন দাসের মুক্তির জন্য তার ও মনিবের মধ্যকার চুক্তি সম্পাদনের কাজ সম্পন্ন হবে, তখন এই চুক্তির কারণে সে মুক্ত হয়ে যাবে এবং সে আর কখনও দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে না। আর এই অবস্থায় সে তার মনিবের নিকট আর্থিকভাবে ঋণী হবে, যেই পরিমাণ অর্থের ব্যাপারে তাদের উভয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

এসব বিধিবিধানকে ইসলাম ‘মুকাতিব’ দাসের জন্য তার মুক্তির ব্যাপারে অপরাপর শরীয়তসম্মত উপায় হিসেবে প্রণয়ন করেছে। বরং এগুলো মুক্তির দরজা উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তির জন্য বড় ধরনের উপায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, দাস-দাসীদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার মনের ভিতরে মুক্তির আগ্রহ অনুভব করে; আর সে তার মনিব কর্তৃক অদূর ভবিষ্যতে স্বেচ্ছায় তাকে মুক্ত করার সুযোগ দিবে কি দিবে না, সেই অপেক্ষা করবে না। কারণ, দাস যখন মনিবের নিকট তাকে মুক্তি দানের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আবেদন করবে, তখন মনিব কর্তৃক সেই চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া আবশ্যিক হবে।

রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে মুক্তি দান:

দাস-দাসীর মুক্তির ক্ষেত্রে এটাও অন্যতম মহান উপায়, বরং এটা হলো ইসলামী সমাজে এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার দাস-দাসীর মুক্তির ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ উপায়সমূহের মধ্যে অন্যতম উপায়।

আর ইসলাম রাষ্ট্রের জন্য যাকাতের অর্থ থেকে দাস-দাসীর মুক্তির জন্য বিশেষ খাত নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই খাতকে আল-কুরআনুল কারীম ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (দাসমুক্তির) খাত নামে নামকরণ করেছে। মুসলিম রাষ্ট্রে দাস-দাসীদের মুক্ত করার জন্য এই খাত সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ৬০]

[৬০]

“সাদাকাহ তো শুধু ফকীর, মিসকীন ও সাদাকাহ আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য।

এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা আত-তাওবা: ৬০]

সুতরাং ইসলামের ইতিহাসের গৌরবময় দিকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অন্যতম একটি দিক হলো: খলিফাদের যুগে যখনই দরিদ্র ও অভাবীদের অভাব পূরণ করে বাইতুল মালের অর্থ অতিরিক্ত হতো, তখনই বাইতুল মালের কোষাধ্যক্ষ দাস-দাসী বিক্রেতাদের হাট থেকে দাসদেরকে ক্রয় করতেন এবং তাদেরকে মুক্ত করে দিতেন।

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ বলেন,

«بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى صَدَقَاتِ إِفْرِيقِيَّةَ، فَجَمَعْتُهَا ثُمَّ طَلَبْتُ فَقَرَاءَ نُعْطِيهَا لَهُمْ فَلَمْ يَحْذِ فَقِيرًا، وَلَمْ يَحْذِ مَنْ يَأْخُذْهَا مِنَّا، فَقَدْ أَغْنَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ النَّاسَ، فَاشْتَرَيْتُ بِهَا عَبِيدًا فَأَعْتَقْتُهُمْ».

“আমাকে উমার ইবন আব্দুল আযীয রাহিমাল্লাহ আফ্রিকাবাসীদের যাকাত বিষয়ে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান, অতঃপর আমি যাকাত সংগ্রহ করলাম, তারপর তা বন্টন করে দেওয়ার জন্য দরিদ্র লোক খোঁজ করলাম, কিন্তু একজন দরিদ্র লোকও খুঁজে পেলাম না এবং এমন কাউকে পেলাম না, যে আমাদের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করবে; কারণ উমার ইবন আব্দুল আযীয রাহিমাল্লাহ জনগণকে সম্পদশালী ও অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন। অতঃপর আমি তার (যাকাতের অর্থ) দ্বারা কতগুলো দাস ক্রয় করলাম এবং তাদেরকে মুক্ত করে দিলাম।”^(১৫)

১৫. ড. উমার ইবন আব্দুল আযীয কুরাইশী, সামাহাতুল ইসলাম (সৌদি আরব: মাকতাবাতুল আদীব, মিসর: আল-মাকতাবাতুয যাহবিয়্যাহ লিন নাশরি ওয়াত তরজামা), ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হিজরী/২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা ১৯৬, ১৯৭।

এছাড়াও যাকাতের অর্থ থেকে ‘মুকাতিব’ দাসদের মুক্ত করার মূল্য পরিশোধের জন্য তাদেরকে সাহায্য করা, যখন তারা তা পরিশোধ করার জন্য বিশেষ উপার্জনে অক্ষম হয়, যা পূর্বে আলোচনা হয়েছে!!

মূলত ইসলাম দাস-দাসী মুক্ত করার ব্যাপারে বাস্তবসম্মত ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আর সেই কর্মসূচী নিয়ে কমপক্ষে সাতশত বছর পরিপূর্ণভাবে ঐতিহাসিক অগ্রগতি হয়েছে এবং এই অগ্রগতির সাথে আরও অতিরিক্ত সংযোজন হয়েছে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার মত উপাদানসমূহ, যার দিকে বিশ্বের অন্যান্যরা কেবল আধুনিক ইতিহাসের শুরুর দিকে যেতে সমর্থ হয়েছে....!!

ইসলাম আরও যেসব নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, সে দিকে বিশ্ব ফিরে তাকায়নি কখনও, চাই দাস-দাসীর সাথে সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে হোক, অথবা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ও বিবর্তনের চাপ ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় তাকে মুক্ত করার প্রসঙ্গে হোক; যা পশ্চিমাদেরকে বাধ্য করেছে দাস-দাসী মুক্ত করে দেওয়ার জন্য!!

এটা বা ওটা যাই হোক এর মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী ও তাদের প্রচারকগণের ছেড়ে দেওয়া যাবতীয় নকলতত্ত্ব ভূপাতিত হয়েছে, যারা মনে করেছে যে, ইসলাম হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতির অস্ত্রসমূহের মধ্যে একটি অস্ত্র, যা তার স্বাভাবিক সময়ে এসেছে দ্বন্দ্বিক বস্তুগত নিয়মনীতির মাধ্যমে; অনুরূপভাবে এর মাধ্যমে তাদের দাবীও অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে যারা মনে করে যে, প্রতিটি ব্যবস্থাপনা, নিয়মনীতি ও মতবাদই এমনকি ইসলামও তার আবির্ভাবের সময়কার অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতিফলন মাত্র। আর তার প্রতিটি বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এই অর্থনৈতিক উন্নতির অনুকূলেই পরিচালিত হয়ে থাকে এবং তাকে স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। সুতরাং

তাদের মতে, কোনো নিয়মনীতি বা ব্যবস্থা অর্থনৈতিক চিন্তাকে ছাড়িয়ে যাবে এমনটি হতে পারে না^(১৬)!!

বস্তুত ইসলাম তার প্রশাসনিক আইন ও শরঈ আইনের ক্ষেত্রে যার অন্যতম হচ্ছে, দাস-দাসী মুক্ত করার নিয়মনীতি, তা তথাকথিত প্রাকৃতিক বিবর্তনের সাতশত বছর পূর্বেই অতিক্রম করেছে; তখন সে (ইসলাম) তৎকালীন আরব উপদ্বীপ ও গোটা বিশ্বের কোনো প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেনি, সে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ছাপ না ছিল দাস-দাসীর সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে, না ছিল সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে; আর না ছিল শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্কের ব্যাপারে কিংবা মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে; বরং তার (ইসলামের) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক রীতিনীতির উৎপত্তি ও স্বয়ংক্রিয়তা ছিল আসমানী শরীয়তের মূলশক্তি ওহীর মাধ্যমে, যার কোনো নথির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বরং ইসলাম তার নিয়মনীতি ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে গড়ে উঠা অন্যান্য নিয়মনীতির ওপর অনন্য স্বকীয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত!!

==O==

সন্তানের মা (উম্মুল ওলাদ) হওয়ার কারণে মুক্তি দান:

অনুরূপভাবে এটাও দাস-দাসী মুক্ত করার উপায়সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি উপায় এবং নারী জাতিকে সম্মান দানের ব্যাপারে ইসলামের কৃতিত্বপূর্ণ কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম মহান কীর্তি।

১৬. ধর্মকে তারা অর্থনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সবকিছুকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর বিচার করেছে। এটা অবশ্যই ভুল চিন্তার ফসল। বিশেষ করে ইসলামের মতো আল্লাহ প্রদত্ত জীবনবিধানের ব্যাপারে এ ধরনের চিন্তা করাও কুফরী। [সম্পাদক]

আর এটা দাস-দাসী মুক্ত করার উপায়সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি উপায়; কারণ দাসী যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তির মালিকানাধীন থাকে, তখন সেই মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার সাথে স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করার মতো মেলামেশা করা বৈধ আছে। ফলে যখন দাসী তার (মনিবের) জন্য সন্তান প্রসব করবে এবং সেও সন্তানকে তার সন্তান বলে স্বীকৃতি দিবে, তখন সে শরীয়তের দৃষ্টিতে 'উম্মুল ওলাদ' (সন্তানের মা) হয়ে যাবে। আর এই অবস্থায় মনিবের ওপর তাকে বিক্রি করা হারাম হয়ে যাবে। যখন সে তার জীবদ্দশায় তাকে আযাদ না করে মারা যাবে, তখন তার মৃত্যুর পর সে সরাসরি স্বাধীন হয়ে যাবে।

আর পূর্ববর্তী যুগসমূহের মধ্যে কত দাসীই না এই পদ্ধতিতে (দাসত্ব থেকে) মুক্তি লাভ করেছে?! কত নারী দাসীই না স্বাধীনতা অর্জনের মত নিয়ামত দ্বারা ধন্য হয়েছে, যখন তারা 'উম্মুল ওলাদ' বা সন্তানের মা হয়েছে?!

অনুরূপভাবে এটা নারী জাতিকে সম্মান দানের ব্যাপারে ইসলামের কৃতিত্বপূর্ণ কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম মহান কীর্তি; কারণ নারী যখন অমুসলিম রাষ্ট্রে যুদ্ধের সময় বিপক্ষ শক্তির মালিকানায় চলে আসে, তখন তার সম্মান লুটের মালের মতো ব্যভিচারের পন্থায় প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য বৈধ হয়ে যায়, বরং সে হয়ে যায় সম্মান হারা, সস্তা পণ্য ও অধিকার বঞ্চিত...।

আর তাকে ইসলামী শাসনব্যবস্থার ছায়াতলে দাসী বানানোর দ্বারা ইসলামের পূর্বে সে যেসব অপমান, অপদস্থ ও অসম্মানের শিকার হয়েছে, তা পরিবর্তন হয়ে গেছে। সুতরাং ইসলাম তার অধিকার সংরক্ষণ করেছে এবং তার মান-সম্মান ও মর্যাদাকে রক্ষা করেছে।

- সে শুধু তার মালিকের বৈধ মালিকানায় থাকেবে, তার মনিব ব্যতীত অন্য কারও জন্য তার সাথে বসবাস করা এবং তার সাথে স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা করার মতো মেলামেশা করা বৈধ হবে না; তবে সে

(মনিব) যখন তাকে বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করে এবং তারপর সে বিয়ে করে, তখন তার মনিবের জন্য তার নিকটবর্তী হওয়া এবং তার সাথে নির্জনে বসবাস করা বৈধ হবে না।

- আর তাকে স্বাধীনতা অর্জন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, ইচ্ছা করলে সে ‘মুকাতাবা’ তথা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে।
- আর সে তার মনিবের মৃত্যুর পর স্বাধীন হয়ে যাবে যখন সে ‘উম্মুল ওলাদ’ তথা সন্তানের মা হবে এবং তার সাথে তার সন্তানও মুক্ত হয়ে যাবে।
- তাছাড়া আবশ্যিকীয়ভাবে সে মনিবের নিকট থেকে উত্তম আচরণ ও সম্মানজনক ব্যবহার পাবে, যেমনিভাবে এই ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত নির্দেশ প্রদান করেছে।

আর এই অর্থ ও তাৎপর্যের মাধ্যমেই নারী তার অস্তিত্ব ও স্বকীয়তার ঘোষণা প্রদান করবে, অনুভব করবে তার সত্তাগত উপস্থিতি এবং ইসলামের নিয়মনীতির ছায়াতলে সে সম্মান ও মর্যাদাবান হিসেবে গৌরব প্রকাশ করবে।

==O==

নির্যাতনমূলক প্রহারের কারণে মুক্তি দান:

কোনো কোনো ফকীহ তথা ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞের মতে এটাও দাস-দাসী মুক্ত করার উপায়সমূহের মধ্যে অন্যতম উপায়; আর তাদের মধ্যে হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণও রয়েছেন। আমরা পূর্বে এমন নিয়মনীতি আলোচনা করেছি, যা দাস-দাসীর সাথে আচার-ব্যবহারের পদ্ধতি হিসেবে ইসলাম প্রণয়ন করেছে। সুতরাং মনিবের জন্য তার ও তার দাস-দাসীর মাঝে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এই মজবুত নিয়মনীতি থেকে বের হয়ে যাওয়া বৈধ হবে না; বরং এই সম্পর্কটি ভালোবাসা, অনুকম্পা ও

পারস্পরিক সম্প্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যিক হবে, যাতে দাস-দাসী তার নিজস্ব অস্তিত্ব ও মানবতাকে অনুভব করতে পারে এবং সে জানতে পারে যে, সে অন্যান্য মানুষের মতই সৃষ্ট মানুষ, তার সম্মান পাওয়া ও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের কাউকে যখন তার দাসকে নির্যাতন ও প্রহার করতে এবং তাকে অপমান-অপদস্থ করতে দেখতেন, তখন তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। সহীহ হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আবু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু কর্তৃক তার দাসকে প্রহার করতে দেখলেন, তারপর তিনি তাকে নিন্দা করে বললেন:

«إِعْلَمْ يَا أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْعَلَامِ»

“হে আবু মাসউদ! জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা এই দাসের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিতে তোমার ওপর সর্বশক্তিমান।”

আর দাস খারাপ কাজ করলে ইসলাম তার মনিব কর্তৃক তাকে শিক্ষামূলক শাস্তি দেওয়ার বিষয়টিকে বৈধ করে দিয়েছে, তখন ইসলামের দৃষ্টিতে এই শাস্তির জন্য একটা নির্ধারিত সীমারেখা রয়েছে। সুতরাং মনিবের জন্য সেই সীমা অতিক্রম করা বৈধ হবে না। আর যখন সে তা লঙ্ঘন করবে, যেমন: মনিব কর্তৃক তার গালে চপোটাঘাত করা, অথবা তার শরীরের সংবেদনশীল কোনো স্থানে আঘাত করা, তখন এই সীমালঙ্ঘনটি দাসত্ব থেকে তার মুক্তির জন্য শরীয়তসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

মুয়াবিয়া ইবন সুওয়াইদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

كُنَّا بَيْنِي مُقَرَّرِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَعْتَقُوهَا»، قَالُوا: لَيْسَ لَهُمْ خَادِمٌ غَيْرُهَا، قَالَ: «فَلْيُسْتَحْدِمُوهَا، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا، فَلْيُخْلَوْا سَبِيلَهَا»

“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বনী মুকাররিন গোত্রের লোক ছিলাম, একজন দাসী ছাড়া আমাদের আর কোনো খাদেম ছিল না। ওই দাসীকে আমাদের একজন চপোটাঘাত করল, তারপর এই বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলে তিনি বললেন: তোমরা তাকে মুক্ত করে দাও। তারা বললেন যে, সে ব্যতীত তাদের আর অন্য কোনো খাদেম নেই; তখন তিনি বললেন: (এই অবস্থায়) তারা যেন তার সেবা গ্রহণ করে। তারপর যখন তাদের নিকট তার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, তখন তারা যেন তাকে মুক্ত করে দেয়।”^(১৭)

আর ইমাম মুসলিম রাহিমাল্লাহু তাঁর সনদে শো‘বা রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ফারাস রাহিমাল্লাহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ ذُكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ زَادَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ فَرَأَى بَظْهَرَهُ أَثَرًا، فَقَالَ لَهُ: أَوْجَعْتُكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: مَا لِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ»

“আমি যাকওয়ান রাহিমাল্লাহুকে যযান রাহিমাল্লাহুর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, আবদুল্লাহ ইবন উমার রাহিমাল্লাহু “আনহু তাঁর এক দাসকে ডাকলেন; এরপর তার পৃষ্ঠদেশে (প্রহারের) দাগ দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন: আমি কি তোমাকে ব্যথা দিয়েছি? সে বলল: না। তখন তিনি বললেন: তুমি মুক্ত। বর্ণনাকারী বললেন: অতঃপর তিনি মাটি থেকে কোনো বস্তু হাতে নিয়ে বললেন: তাকে আঘাত করার মধ্যে এতটুকু পুণ্যও মিলেনি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: যে ব্যক্তি আপন দাসকে বিনা অপরাধে প্রহার করল কিংবা

১৭. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৬৫৮।

চপোটাঘাত করল, তাহলে তার কাফ্ফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেওয়া।”^(১৮)

জেনে রাখুন, ইসলামের শরীয়ত তথা আইন-কানুন দাস-দাসীর প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ প্রদানে এবং তাকে সম্মান দান ও তার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য উৎসাহ প্রদানে কত মহান? আর তা কত উচ্চমানসম্পন্ন, যখন তা অত্যাচারীর (দাসের উপর) সীমালঙ্ঘন করাটাকে দাসত্বের শৃঙ্খল ও গোলামীর জিহ্মতি থেকে তার মুক্তির জন্য শরীয়তসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত কারণ বলে ঠিক করেছে?!!

এটাই হলো দাস-দাসীদের মুক্ত করার ব্যাপারে ইসলাম কর্তৃক প্রণীত মূলনীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যতম বৈশিষ্ট্য...।

আর অধিকাংশের মূল্যায়নে দেখা যায় যে, ইসলাম যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, তার মত করে গোটা বিশ্বে (প্রচলিত) সামাজিক শাসননীতির মধ্যে কোনো একটি শাসনতন্ত্রও পাওয়া যাবে না, যা ইতিবাচক ও বাস্তবসম্মত উপায়ে দাস-দাসী মুক্ত করার দিকে আহ্বান করে!!

==O==

১৮. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ১৬৫৭।

প্রিয় পাঠক!

আপনি লক্ষ্য করেছেন যে, (ইসলামী শরীয়তে দাস মুক্তির জন্য মূলত কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছিল:) এই পদ্ধতির অন্যতম মূলনীতি হলো:

- উৎসাহ বা অনুপ্রেরণার মাধ্যমে (দাস) আযাদ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা।
- গুনাহ ও ভুলত্রুটি থেকে মাফ পাওয়ার উদ্দেশ্যে (দাস) আযাদ করা।
- দাস কর্তৃক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার জন্য তার মনিবের সাথে ঐকমত্যের ভিত্তিতে লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার দ্বারা মুক্তি লাভ করা।
- যাকাতের অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে (দাস) আযাদ করা।
- স্বাধীন ব্যক্তির অধীনস্থ দাসী কর্তৃক সন্তান জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা।
- (মনিব কর্তৃক দাসকে) প্রহার করা ও নির্যাতনমূলক সীমালঙ্ঘন করার কারণে (দাস) আযাদ করা।

দাস-দাসীদেরকে মুক্ত করার ব্যাপারে যখন ইসলাম এসব মূলনীতি প্রণয়ন করে, তখন ইসলামী ভূখণ্ডের উপর একজন দাস-দাসীও কি অবশিষ্ট থাকবে বলে মনে হয়?

আমরা যখন দাসপ্রথাকে এমন একটি নদীর সাথে তুলনা করি, যার একটি দুর্বল উৎস রয়েছে এবং একই সময়ে এখানে সেখানে যার একাধিক শক্তিশালী প্রবল স্রোতসম্পন্ন মোহনা বা মুখ রয়েছে। সুতরাং কোনো মানুষ

কি কল্পনা করতে পারে যে, সেই নদীর পানি থেকে এতটুকুন পানি অবশিষ্ট থাকবে?

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় দাসত্বের বিষয়টিও এমনই; কারণ তারও একটি দুর্বল উৎস^(১৯) রয়েছে; আর তা হলো শুধু যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী বানানো, যখন শাসক এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন।

আর (দাস-দাসী) মুক্ত করার স্রোতধারা অনেকেগুলো এবং বহু রকমের, যার বর্ণনা ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

আর এসব স্রোতধারা, যেগুলো শরীয়তসম্মত প্রবাহ সৃষ্টি করেছে, তার ফলে যুগ যুগ ধরে চূড়ান্তভাবে দাসপ্রথার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তার উৎসস্থল শুকিয়ে যাওয়ার কারণে এবং তার মোহনার সংখ্যাধিক্যের ফলে ইসলামী সমাজে তার কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই...। আর এটাই আল্লাহর বিধান। সুতরাং আপনারা আমাকে দেখান তো, যারা তাঁকে বাদ দিয়ে নিয়মনীতি প্রণয়ন করেছে, (তাদের পরিণতি), কিন্তু যালিমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে!!

==O==

১৯. আমরা যুদ্ধবন্দীদের দাস-দাসী বানানোর উৎসকে দুর্বল উৎস বলে বর্ণনা করেছি দু'টি কারণে:

প্রথমত: স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধের স্বল্পতা।

দ্বিতীয়ত: ইসলাম কর্তৃক ইমাম বা নেতাকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচার-আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে চারটি বিষয়ে (ক্ষমতা প্রয়োগে) স্বাধীনতা দান: অনুকম্পা প্রদর্শন অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ অথবা হত্যা করা অথবা দাস-দাসী বানানো। আর অধিকাংশ সময় দাস-দাসী বানানোর বিষয়টিকে বাদ রেখে বাকি অন্যান্য ক্ষেত্রে তার স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ হয়।

ইসলাম কেন দাসপ্রথাকে চূড়ান্তভাবে বাতিল করেনি?

ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, ইসলাম তথাকথিত দাসপ্রথার সকল উৎস আরব উপদ্বীপ ও অন্যান্য স্থানে একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। আর তার দ্বারা সম্ভব ছিল সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে দাসপ্রথাকে চূড়ান্তভাবে বাতিল বলে ঘোষণা করা, যেমনিভাবে বাতিল করে দিয়েছে মাদকদ্রব্য, সুদ প্রথা ও যিনা-ব্যভিচারকে। যদি (দাসপ্রথার) একটি মূল উৎসস্থল না থাকত, তাহলে দাসপ্রথা সকল স্থানেই ছড়িয়ে যেত এবং সকল জাতি ও রাষ্ট্র প্রত্যেক ফোঁটায় ফোঁটায় তার দ্বারা পরস্পর ব্যবসা-বাণিজ্য করত। সেই মূল উৎসস্থল হলো যুদ্ধের কারণে দাসত্ব, আর ইসলাম প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের কারণে দাসত্বের এই উৎসস্থলটিকে সুস্পষ্ট ও অকাট্য বক্তব্যের দ্বারা বাতিল করেনি অনেকগুলো দিক বিবেচনা করে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো:

১. আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি
২. রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি
৩. আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি
৪. সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি
৫. শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি

অচিরেই আমরা এই পাঁচটি দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যেকটির ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করব। আল্লাহর কাছেই রয়েছে সরল পথের দিশা:

আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি:

আমরা পূর্বেই যখন দাসত্বের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনার উদ্যোগ নিই, তখন আলোচনা করেছি যে, ইসলামের আগমন ঘটেছে এমতাবস্থায় যে বিশ্বের সকল শাসনব্যবস্থায় দাসপ্রথা স্বীকৃত; বরং তা ছিল বহুল প্রচলিত

অর্থনৈতিক মুদ্রাস্ফূর্তি এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রয়োজন, যা কেউ অপছন্দ করত না এবং তা পরিবর্তন করার সম্ভাব্যতার ব্যাপারে চিন্তা করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

আর যে স্তরে এসে আজ দাসপ্রথাকে বাতিল করা হলো, তার পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কে জানে? সম্ভবত এমন একদিন আসবে, যেদিন দাস-দাসী বানানোর প্রথা বিশ্বে আবার ফিরে আসবে; বিশেষ করে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী বানানোর প্রথা—আর দাসত্ব হয়ে যাবে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রথা, বহুল প্রচলিত একটি অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং সামাজিকভাবে খুব প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

সুতরাং উক্ত অবস্থায় এটা কোনোভাবেই বিবেকসম্মত হবে না যে, এর মোকাবিলায় ইসলাম হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। বরং অচিরেই ইসলামকেও অনুরূপ নীতির পুণঃপ্রচলন করতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যা এই ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে দিবে অথবা বাতিল করে দিবে। আর এর জন্য অনেক দীর্ঘ ও লম্বা সময়ের প্রয়োজন হবে। আরও প্রয়োজন হবে জনগণ কর্তৃক ইসলামের প্রকৃত বাস্তবতা এবং সৃষ্টি, জীবন ও মানুষের ব্যাপারে তার সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন সম্পর্কে অনুধাবন করা। আরও জরুরি হলো দাস-দাসী কর্তৃক মানবিক সম্মানের তাৎপর্য এবং মানবিক মর্যাদা ও সম্মানের অধিকার উপভোগ করা, যাতে তারা এই উপভোগ ও উপলব্ধির পরে অপমান ও অসম্মান থেকে তাদের স্বাধীনতা দাবি করতে পারে এবং তারা আরও দাবি করতে পারে গোলামী থেকে তাদের মুক্তির...।

বস্তুত বিংশ শতাব্দীতে দাসত্ব অন্য আরেক রং বা রূপ ধারণ করেছে, যার বিবরণ অচিরেই আসছে। সুতরাং (বর্তমানে) দাসত্ব মানে ভূখণ্ডের মলিকানা গ্রহণ, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী বানানো এবং প্রভাবশালীগণ কর্তৃক দুর্বল শ্রেণির লোকদেরকে দাস বানানো থেকে পরিবর্তন হয়ে গোটা জনগোষ্ঠীকে দাস-দাসী বানানোর দিকে পরিবর্তিত হয়েছে বলে বুঝায়, যেমনটি বিদ্রোহী

উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো এবং নাস্তিক্যবাদী সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলো করছে; কারণ তারা জনগণের মধ্যে ব্যাপক হৃদয়বিদারক ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করে তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে হরণ করে এবং তাদেরকে তাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে। আর তাদেরকে আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তির বলে শাসন করে; ফলে তারা কোনো মাথাকে উঁচু হয়ে দাঁড়ানোর এবং কোনো কণ্ঠকে কথা বলার সুযোগ দেয় না। এসব জনগোষ্ঠীর নিকট যে সম্পদরাশি আছে এবং তারা কর্মক্ষেত্রে ও অর্থনীতির ময়দানে যে শ্রম বিনোয়াগ করে সেসব কিছু উপনিবেশবাদী অথবা সমাজতান্ত্রিক স্বৈরাচার সরকারের নিকট সমর্পণ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যাতে জাতিসমূহকে দাস-দাসী বানানো, জনগোষ্ঠীকে বশীভূত করা, স্বাধীনতাকে অপদস্থ করা এবং মানবিক সম্মান ও মর্যাদাকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে তারা তা ব্যয় করতে পারে।

আর এই অবস্থায় অসম্ভব নয় যে, উপনিবেশিক শাসকবর্গ অথবা সমাজতান্ত্রিক শাসকগণ তাদের দাসপ্রথা চাপিয়ে দিবে ব্যক্তি, অথবা পরিবার, অথবা গ্রাম, অথবা কোনো পুরো জাতি বা গোষ্ঠীর উপর, যাতে সকলকে আধুনিক দাস-দাসীর হাটে সম্পদ বা স্বার্থের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে তাদেরকে বশীভূত ও দাসে পরিণত করার জন্য!!

এ কারণেই ইসলাম অকাট্য ‘নস’ তথা বক্তব্যের মাধ্যমে দাসপ্রথাকে চূড়ান্তভাবে বাতিল করেনি^(২০)।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি:

আমরা ইতঃপূর্বে এটাও আলোচনা করেছি যে, ইসলাম মুসলিমদের শাসককে যুদ্ধবন্দীদের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে অনুকম্পা প্রদর্শন, অথবা

২০. অর্থাৎ প্রয়োজনে যেন আবার তা ব্যবহার করতে পারে। যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে এ ধরনের দাসত্ব পরিচালিত করবে ইসলামও যেন তাদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করতে পারে। [সম্পাদক]

মুক্তিপণ গ্রহণ, অথবা হত্যা করা, অথবা দাস-দাসী বানানো ইত্যাদি বাছাইয়ের ব্যাপারে নিঃশর্ত ক্ষমতা প্রদান করেছে।

নিঃসন্দেহে, শাসক যখন কোনো বিষয়ে প্রকৃত হিকমত ও কল্যাণ লক্ষ্য করবেন এবং যখন গভীর ও ব্যাপক রাজনৈতিক সংকট লক্ষ্য করবেন, তখন তিনি যুদ্ধবন্দীদের সাথে সে অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে আচার-আচরণ ও লেনদেন করবেন; কারণ তাকে তো শেষ পর্যন্ত একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান ও গ্রহণযোগ্য স্বার্থকেই গ্রহণ করে নিতে হবে।

সুতরাং তিনি যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে হত্যা করার নীতি অবলম্বন করা থেকে দূরে সরে যাবেন না, যখন তিনি মুসলিমদেরকে নড়বড়ে ও দুর্বল অবস্থার মধ্যে দেখবেন। তিনি যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুকম্পা প্রদর্শন অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ করার নীতি অবলম্বন করা থেকে দূরে সরে যাবেন না, যখন তিনি মুসলিমদেরকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী অবস্থার মধ্যে দেখবেন। তিনি যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে দাস-দাসী বানানোর নীতি অবলম্বন করা থেকে দূরে সরে যাবেন না, যখন তিনি শত্রুদেরকে দেখবেন তারা আমাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করছে, যাতে পরস্পরের আচরণ সমান সমান হয়।

এভাবেই শাসক রাজনৈতিক কল্যাণ, যুদ্ধকেন্দ্রিক আবশ্যিকতা ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন লক্ষ্য করে তাঁর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সুতরাং কীভাবে ইসলাম সুস্পষ্ট ও অকাটা ‘নস’ তথা বক্তব্যের মাধ্যমে দাসপ্রথাকে বাতিল করবে, অথচ শত্রুদের পক্ষ থেকে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী বানানোর বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা রয়েছে; আর এই সম্ভাবনার বাস্তবায়ন প্রায় আসন্ন হয়ে পড়েছে!!

আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি:

অনুরূপভাবে আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় বর্ণনা করেছি যে, ইসলাম যখন দাস-দাসীর সাথে সদ্ব্যবহার এবং তার চারিত্রিক, সামাজিক ও মানবিক মর্যাদাকে সমুল্যত রাখার ব্যাপারে পরিপূর্ণ নিয়মকানুন প্রণয়ন করেছে তখন এর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, দাস-দাসী কর্তৃক তার মানবিক মর্যাদা, অস্তিত্ব ও অবস্থান উপলব্ধি করা, যাতে সে পরবর্তীতে দাসত্ব থেকে তার মুক্তি দাবি করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে।

আর আমরা পূর্বে এটাও দেখিয়েছি যে, ইসলাম বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থা থেকে দাস-দাসীকে মুক্ত করার পূর্বে তাকে তার মনের ভেতর ও হৃদয়ের গভীর থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেছে, যাতে সে তার অস্তিত্ব ও মান-সম্মানকে অনুভব করতে পারে; ফলে সে নিজে নিজেই স্বাধীনতা দাবি করবে এবং সে যখন তা দাবি করবে, তখন সে শরীয়তকে এই স্বাধীনতার জন্য সর্বোত্তম নিশ্চয়তা বিধানকারী এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বোত্তম অভিভাবক হিসেবে পাবে। আর এটা আমরা ‘মুকাতাবা’ তথা লিখিত চুক্তির মাধ্যমে দাস আযাদ করার প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আদেশ বা ফরমান জারি করার মাধ্যমে দাস-দাসী মুক্ত করার দ্বারা আসলেই দাস-দাসীর মুক্তি অর্জিত হয়নি, যেমন তার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আমরা যা বলি, তার পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো ‘আব্রাহাম লিংকন’ এর হাতের কলমের নির্দেশ (লেখার) দ্বারা দাস-দাসী মুক্ত করে দেওয়ার ব্যাপারে আমেরিকান অভিজ্ঞতা; কারণ বাহ্যিকভাবে আইনের দ্বারা লিংকন যেসব দাসকে মুক্ত করে দিয়েছিল, তারা স্বাধীন হতে পারেনি বরং তারা তাদের মনিবদের কাছেই ফিরে গেছে, তারা তাদের নিকট আশা করে যে, তারা তাদেরকে দাস হিসেবে পুনরায় গ্রহণ করে নিবে, যেমন তারা (দাস হিসেবে) ছিল; কারণ (স্বাধীন করে দেওয়ার পরেও) তারা মন স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি এবং পারেনি তারা

তাদের অপ্রত্যাশিত মুক্তি পাওয়ার দ্বারা মানবিক সুখ ও মর্যাদা অনুভব করতে...।

অন্যদিকে ইসলামের নীতি ও অপরাপর সামাজিক শাসন ব্যবস্থাসমূহে দাস-দাসী নীতির রয়েছে বিস্তার ফারাক। কারণ, ইসলাম দাসত্বের ছায়ায় দাস-দাসীর সাথে মানবিক ও উদার আচরণ করে থাকে (যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে), এমনকি সে যখন এই সদ্ব্যবহার (যথাযথভাবে) উপভোগ ও উপলব্ধি করে, তখন সে শরীয়তের ছায়াতলে তার স্বাধীনতা দাবি করে এবং তার গোলামীর অবস্থা থেকে সে বেরিয়ে যায়; আর তখন সে হয় সম্মানিত মানুষ, সর্বোচ্চ আবেগ ও অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম সম্মান, মর্যাদা ও অস্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি...।

আর এখানেই ইসলাম কর্তৃক দাস-দাসীকে দাসত্বের ওপর অবশিষ্ট রাখার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠে, যেখানে সে তার নিজস্ব সত্ত্বা ও অস্তিত্বকে অনুভব ও উপলব্ধি করবে; আর তখনই সে তার ইচ্ছামত সময় ও যথাযথ পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে ‘মুক্তাভাবা’ (লিখিত চুক্তি) পদ্ধতির মাধ্যমে তার স্বাধীনতা দাবি করবে!!

এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই ইসলাম কোনো স্পষ্ট ফরমান জারি ও অকাট্য ‘নস’ তথা বক্তব্যের মাধ্যমে দাসপ্রথাকে চূড়ান্তভাবে বাতিল করেনি।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি:

কখনও কখনও দাসপ্রথা বিদ্যমান থাকার মধ্যে বড় ধরনের সামাজিক কল্যাণ নিহিত থাকে, যেমন: তার (দাসপ্রথার) উপস্থিতি জাতিগত বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্যবাদ ও অবক্ষয়ের প্রবাহ থেকে সমাজকে পবিত্র রাখার ব্যাপারে ভূমিকা রাখে। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ যে ব্যক্তি অতিরিক্ত মোহরের কারণে কোনো স্বাধীন নারীকে বিয়ে করতে অক্ষম হয়, তখন সে কোনো দাসীকে বিয়ে করবে অথবা ক্রয় সূত্রে তার মালিক হবে, যাতে সে বৈধ উপায়ে তার স্বভাগত চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং বৈধ মালিকানার মাধ্যমে সে নিজেকে পাপমুক্ত রাখতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ أَنْ تَتَيْنَ بِفَدْحَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيُثَوِّبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ١٢﴾ [النساء: ٢٧، ٢٥]

“আর তোমাদের মধ্যে কারো মুক্ত ঈমানদার নারী বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার দাসী বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান; কাজেই তোমরা তাদেরকে বিয়ে করবে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে এবং তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দিবে ন্যায়সঙ্গতভাবে। তারা হবে সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিণী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়। অতঃপর বিবাহিতা হওয়ার পর যদি তারা ব্যভিচার করে, তবে তাদের শাস্তি মুক্ত নারীর অর্ধেক। তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারকে ভয় করে এগুলো তাদের জন্য। আর ধৈর্য ধারণ করা তোমাদের জন্য মঙ্গল। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু। আল্লাহ ইচ্ছে করেন তোমাদের কাছে বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও।” [সূরা আন-নিসা: ২৫-২৭]

জনকল্যাণকর অনেক কাজ রয়েছে, যাতে সমাজ পর্দাহীন নারীদের প্রয়োজন অনুভব করে। আর দাসীরাই হলো এই শ্রেণি; কেননা ইসলাম

দাসীর ওপর স্বাধীন নারীর মতো পরিপূর্ণভাবে পর্দা করাকে ফরয করেনি; বরং শরীয়তের দৃষ্টিতে তার বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখাই যথেষ্ট।

কখনও কখনও যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত নারীকে দাসী বানানো তার পবিত্রতা রক্ষা, অভিভাবকত্ব এবং তার মানবিক সম্মান রক্ষার জন্য একটা সফল প্রতিষেধক বিবেচিত হতে পারে; কারণ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে ব্যক্তি তার দায়ভার গ্রহণ করবে, সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার সাথে তার স্বামী অথবা তার ভাইয়ের মত আচরণ করবে; অথচ তাকে ছেড়ে দেওয়ার মানেই হলো তাকে নিশ্চিত ধ্বংস ও ক্ষতির দিকে ঠেলে দেওয়া।

আর এটা জানা কথা যে, ইসলামী শাসনব্যবস্থার ছায়াতলে নারীকে দাসী বানানোর মানে হলো তাকে তার মনিবের জন্য শুধু মালিকানা সাব্যস্ত করে দেওয়া, সে ব্যতীত অন্য কেউ তাকে ভোগ করতে পারবে না। আর ইসলাম ‘মুকাতাবা’ পদ্ধতির মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করার বিষয়টিকে তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে এবং অনুরূপভাবে সে তার মনিবের মৃত্যুর পর সরাসরি স্বাধীন হয়ে যাবে, যখন সে তার মনিবের জন্য কোনো সম্মানের জন্ম দিবে; তাছাড়া সে তার মনিবের ঘরে ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে সার্বিক তত্ত্বাবধান, আদর-যত্ন ও উত্তম ব্যবহার পাবে।

পক্ষান্তরে অমুসলিম রাষ্ট্রে তাকে দাসী হিসেবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য হলো তার ইজ্জত নষ্ট করা এবং তার মান-মর্যাদাকে অবজ্ঞা করা, বরং তার ইজ্জত-আব্রু প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষীর ব্যাভিচারের মাধ্যমে লুণ্ঠিত হওয়া।

তাছাড়াও সে অসদাচরণ ও প্রকাশ্য অনুভবযোগ্য অপমান-অপদস্থের শিকার হয়!

অতএব দাস-দাসী বানানোটো কখনও কখনও সামাজিকভাবে কল্যাণকর হবে, আবার কখনও নৈতিকতার দিক বিবেচনায় হবে এবং কখনও মানবিক অনুকম্পার বাস্তবায়নার্থে দায়িত্ব গ্রহণের ফায়দা দিবে, যা সচেতন আলেম ব্যতীত অন্য কেউ অনুধাবন করতে পারবে না। এই দিক বিবেচনা

করেই ইসলাম কোনো স্পষ্ট ফরমান জারি ও অকাট্য 'নস' তথা বক্তব্যের মাধ্যমে দাসপ্রথাকে চূড়ান্তভাবে বাতিল করেনি।

শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি:

প্রত্যেক বিবেকবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট একথা পরিষ্কার যে, ইসলামের শাসনব্যবস্থায় দাসত্বের ব্যাপারটি এক লাফেই সমাধান হয়নি; আর তাকে নিষিদ্ধ করে আসমান থেকে কোনো অকাট্য বক্তব্যও অবতীর্ণ হয়নি, বরং তার সমাধান হয় ক্রমান্বয়ে শরঈ বিধানের মাধ্যমে এবং সময়ের বিবর্তনে, যা শেষ পর্যায়ে কোনো প্রকার গুণ্ণগোলের উস্কানি অথবা সঙ্কট ছাড়াই বাতিল হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

কীভাবে এটা সম্ভব হলো?

আমরা পূর্বেই যখন দাসপ্রথা বাতিল না করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনার উদ্যোগ গ্রহণ করি তখন আলোচনা করেছি যে, ইসলামের আগমন ঘটেছে এমতাবস্থায় যে বিশ্বের সকল শাসনব্যবস্থায় দাসপ্রথা স্বীকৃত; বরং তা ছিল অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং সামাজিকভাবে খুব জরুরি ও প্রয়োজনীয়। আমরা দেখিয়েছিলাম যে, এই ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা অথবা বিলুপ্ত করে দেওয়া খুব সহজ কাজ নয়; বরং তার জন্য প্রয়োজন সাধারণ ক্রমধারা অবলম্বন এবং দীর্ঘ সময়...।

এই ক্রমধারা কেমন ছিল?

১. পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, ইসলাম বিশ্বের দেশে দেশে দাসত্বের একটি উৎস ছাড়া বাকি সকল উৎসকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে; আর সে একটি উৎস হলো যুদ্ধবন্দীদের দাসত্ব।
 - (ইসলাম) যুদ্ধে দাস-দাসী বানানো ও জনগোষ্ঠীর রক্ত শোষণ করার লোভে দাস-দাসী বানানোর ধারা বন্ধ করে দিয়েছে।

- দরিদ্রতা অথবা ঋণ পরিশোধ করতে না পারার অজুহাতে দাস-দাসী বানানোর ধারাও বন্ধ করে দিয়েছে।
- একটা নির্দিষ্ট জাতি ও প্রকৃতির লোকজনের মধ্যে জন্মগত উত্তরাধিকারের কারণে দাস-দাসী বানানোর ধারাও বন্ধ করে দিয়েছে।
- অভিজাত ও অহংকারী শ্রেণির লোকজনের প্রতি দুর্ব্যবহার করার কারণে দাস-দাসী বানানোর ধারাও বন্ধ করে দিয়েছে।

দাস-দাসী বানানোর এ রকম আরও বহু ধরনের উৎস ও ধারাগুলো ইসলাম বন্ধ করে দিয়েছে, যা ছিল বিশ্বে প্রভাব বিস্তারকারী।

২. ইসলাম শর্ত করে দিয়েছে যে, ওই যুদ্ধটি শরীয়তসম্মত যুদ্ধ হতে হবে, যা যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী বানানোর দিকে নিয়ে যায়। পূর্বে আমরা এসব শরীয়তসম্মত যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করেছি, যেসব যুদ্ধ যুদ্ধবন্দীকে দাস-দাসী বানানোর জন্য ন্যায্যসঙ্গত ও যথাযথ।
৩. যুদ্ধের ভার (অস্ত্র) নামিয়ে ফেলার পর যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম শাসককে ব্যাপক ক্ষমতা দান করেছে, তিনি যা কল্যাণকর মনে করবেন তাই করতে পারবেন; বরং ইসলাম তাকে (যুদ্ধবন্দীদের ক্ষেত্রে) অনুকম্পা প্রদর্শন অথবা মুক্তিপণ গ্রহণ অথবা হত্যা করা অথবা দাস-দাসী বানানোর ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছে! সুতরাং তিনি যদি রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী বানানো থেকে বিরত থাকবেন বলে মনে করেন, তবে তিনি তাই করবেন, যেমনটি করেছেন সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ।
৪. দাসত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও ইসলাম দাস-দাসী মুক্ত করার মোহনাসমূহ খুলে দিয়েছে, যা সেই প্রথাটিকে বিলুপ্ত করার দায়িত্ব

পালন করে একটি সময়ের মধ্যে, যে সময়টি কখনও দীর্ঘ হয় অথবা কখনও সংক্ষিপ্ত হয়।

আর আমরা পরিপূর্ণ পদ্ধতি পূর্বে আলোচনা করেছি অথবা এমন বর্ণনা পেশ করেছি, যা ইসলামী শরীয়তের ছায়াতলে দাস-দাসী মুক্ত করার ব্যাপারে অনেক মোহনার (ধারার) কথা স্পষ্ট করেছে।

আর এর ফলে মানব সমাজে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; আর ইসলাম দাস-দাসী মুক্ত করার পদ্ধতি প্রণয়নে রাষ্ট্রসমূহের জন্য একটি আদর্শ নমুনা পেশ করেছে, বরং তাকে মুক্ত করার ব্যাপারে সাত শতাব্দী পূর্বেই জাতিসমূহকে পিছনে ফেলে দিয়েছে!!

সারকথা:

ইসলাম দাসপ্রথাকে এক লাফেই অকাট্য ‘নস’ বা বক্তব্যের মাধ্যমে নিষেধ করে দেয়নি; বরং তার উৎস বা ধারাসমূহ বন্ধ করার মাধ্যমে তার চারপাশের বেষ্টন সংকীর্ণ করে এনেছে এবং তা থেকে মুক্ত করার জন্য অনেক মোহনা খুলে দিয়েছে। অতঃপর ভবিষ্যতে তা শেষ করে দেওয়া বা বলবৎ রাখার লাগামটি শাসকের হাতে তুলে দিয়েছে, তিনি সমান আচরণ নীতি অথবা রাষ্ট্রীয় সন্ধি-চুক্তির ভিত্তিতে নির্দেশনা প্রদান করবেন। শরীয়ত তার জন্য যতটুকু ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, তিনি তার আলোকে যা কল্যাণকর মনে করবেন, তাই তিনি (বাস্তবায়ন) করবেন।

বস্তুত দাসত্বের বিষয়টি বিলুপ্ত করার ক্ষেত্রে এই ক্রমধারা অবলম্বন বিবিধ সমস্যা সমাধান ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিবিধান করার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের মহত্ত্বই প্রকাশিত হয়। আর এ ক্রমধারা অবলম্বনের মাধ্যমে সময় ও কালের প্রসারতায় ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলি, ব্যাপকতা ও আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত দীনের বৈশিষ্ট্যসমূহ খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে!!

সুতরাং তারা এর পর আর কোন কথায় ঈমান আনবে?

প্রিয় পাঠক!

এই বর্ণনা ও বাস্তব চিত্র তুলে ধরার পর আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, ইসলাম যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী বানানোর ধারাকে বাতিল করেনি আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও শরীয়তের বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে।

আর এসব দৃষ্টিভঙ্গি তাগিদ করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবতার জন্য শাসনব্যবস্থা ও বিধিবিধান প্রবর্তন করেছেন, তিনি ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা, সমাজের ক্রমবিকাশ, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, শরীয়তের তাৎপর্য এবং জাতিসমূহের অবস্থাাদি সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জ্ঞাত। তিনি সে অবস্থা সম্পর্কেও জানেন, যখন সমকালীন অবস্থা কিংবা তাৎক্ষণিক কোনো প্রয়োজন বা চাহিদার দোহাই দিয়ে সে এই ব্যবস্থাকে বাতিল করা কিংবা পরিবর্তন করার দাবি উঠবে!!

সুতরাং যদি আল্লাহ জানতেন যে মদ নিষিদ্ধ করার জন্য সাথে সাথে কার্যকর হওয়ার মতো একটি আইন জারি করাই যথেষ্ট, তবে তিনি তা বহু বছর ধরে (ধীরে ধীরে) হারাম করতেন না; আর যদি তিনি জানতেন যে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করার জন্য অবিলম্বে তা শেষ করার একটি নির্দেশই যথেষ্ট, তবে এই বিলুপ্তির প্রক্রিয়া কখনো থেমে থাকত না!!

কিন্তু আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জান না। আল-কুরআনের ভাষায়:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [المالك: ١٤]

“যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত।” [সূরা আল-মুলক: ১৪]

বর্তমান বিশ্বে দাসপ্রথা আছে কি?

এটি সত্য যে ফরাসি বিপ্লব ইউরোপে এবং আব্রাহাম লিংকন আমেরিকায় দাসপ্রথার বিলোপ ঘটান। মূলত এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনার পরই বিশ্বব্যাপী দাসপ্রথা বিলুপ্তির পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়!!

এ সবই অর্জন হয়েছে সত্য, কিন্তু আমাদের জন্য উচিৎ হলো নাম দ্বারা প্রতারিত না হওয়া এবং গ্লোবাল দ্বারা ধোঁকা না খাওয়া, আর যদি তা না হয়, তাহলে যে দাসত্বকে বাতিল করা হয়েছে তা কোথায়? বর্তমান বিশ্বের নানা প্রান্তে যা ঘটছে, আমরা তার কী নাম রাখতে পারি? ইসলামী মরক্কোয় ফ্রান্সের নিপীড়ন, নিজেদের দেশে কৃষকদের ওপর আমেরিকার বৈষম্যমূলক আচরণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভিন্নবর্ণের মানুষের প্রতি ব্রিটেনের বর্ণবাদী নীতি, কিংবা সাম্রাজ্যভুক্ত মুসলিম দেশগুলোতে রাশিয়ার শোষণ ও অত্যাচারকে আমরা দাসত্ব ছাড়া আর কী-ই বা বলতে পারি?

দাসত্বের প্রকৃত অর্থ কি এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের অধীন করে দেওয়া এবং মানুষের এক দল কর্তৃক অপর দলকে বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নাম নয়? যেমনটি প্রফেসর মুহাম্মাদ কুতুব বলেছেন; নাকি তা এটা ছাড়া অন্য কোনো কিছুই নাম?

আর এটা যদি হয় দাসত্বের নামে অথবা স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমতার নামে, তাহলে তার অর্থ কি হবে? আর চকচকে নাম দিয়ে কী লাভ হবে, যখন বাস্তবতার আড়ালে থাকে নিকৃষ্ট বিষয়, যা মানবতা উপলব্ধি করেছে দীর্ঘ ইতিহাসের বাস্তবতা থেকে?

ইসলাম তার নিজের সাথে ও মানুষের সাথে খুবই স্পষ্ট, সুতরাং সে বলে: এটি দাসত্ব এবং তার একমাত্র কারণ এই, আর এটি থেকে মুক্ত হওয়ার পথ উন্মুক্ত, এমনকি প্রয়োজন হলে এটি সম্পূর্ণ নির্মূল করার পথও বিদ্যমান। কিন্তু আজকের যে ভূয়া বা কৃত্রিম সভ্যতার কোলে আমরা বাস

করছি, সে নিজের ভেতরে এই স্পষ্টতা বা সততা খুঁজে পায় না। তাই সে তার সমস্ত দক্ষতা ব্যয় করে সত্যকে বিকৃত করতে এবং চকচকে সাইনবোর্ডে রঙ মাখাতে!!

সুতরাং তিউনেশিয়া, আলজিরিয়া ও মরক্কোয় লক্ষ মানুষের (মুসলিমের) নিহত হওয়ার পিছনে কোনো কারণ ছিল না, বরং তারা শুধু স্বাধীনতা ও মানিবক মর্যাদা ও মূল্যবোধ দাবি করেছিল!!

আফ্রিকাতে নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য লক্ষ মানুষের নিহত হওয়া, তাদের লক্ষ্য ছিল, তারা যাতে তাদের দেশে মাথা উঁচু করে সম্মানের সাথে বসবাস করতে পারে, তাদের নিজস্ব আকিদার প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারে, কথা বলতে পারে তাদের নিজস্ব ভাষায় এবং তারা তাদের নিজেদের সেবা-যত্ন নিজেরা করতে পারে!!

আর রাশিয়ায় লক্ষ মুসলিমের নিহত হওয়ার কারণ ছিল, তারা রাশিয়ার নাস্তিক্যবাদী আকিদা বা মতবাদ এবং তার মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে পারেনি... ওইসব নির্দোষ মুসলিমদেরকে হত্যা করা হয়েছে, তাদেরকে খাদ্য ও পানি না দিয়ে নোংরা কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাদের মান-সম্মানকে বিনষ্ট করা হয়েছে এবং তাদের নারীদের ওপর চড়াও হয়েছে, তাদেরকে উলঙ্গ অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের পেটকে চিড়ে ফেলা হয়েছে তাদের গর্ভস্থ ভ্রূণের শ্রেণি বিন্যাসে বাজি ধরার জন্য!!

বিংশ শতাব্দীতে এটাকেই তারা স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমতা ইত্যাদি নকল শ্লোগানের ছত্রছায়ায় সভ্যতা ও নগরায়ণ বলে নামকরণ করে; আর আমরা তাকে এক অভিনব কায়দার গোলামী, নির্যাতন ও দাস-দাসী বানানো বলে অবহিত করি।

ইসলাম দাস-দাসীর জন্য স্বেচ্ছায় তার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য সম্মান প্রদানস্বরূপ তার সকল অবস্থায় ১৩শ' বছর পূর্বে সম্মানজনক ও

দৃষ্টান্তমূলক আচার-ব্যবহার উপহার দিয়েছে। আর বিদ্বৈষ পোষণকারীদের দৃষ্টিতে এর নাম হচ্ছে পশ্চাৎপদতা, অধপতন ও বোকামি।

- যখন আমেরিকাবাসী কর্তৃক তাদের হোটেল ও ক্লাবগুলোর সামনে প্লাকার্ড (placard) স্থাপন করেছে, যেখানে স্পষ্টভাবে লেখা থাকে “শুধু শ্বেতাঙ্গদের জন্য”, কিংবা আরও নির্লজ্জভাবে ঘোষণা করে “কৃষ্ণাঙ্গ ও কুকুরের প্রবেশ নিষেধ” (তখন একে কীভাবে সভ্যতা ও স্বাধীনতার নিদর্শন বলা যায়?)
- যখন একদল শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি ভিন্ন বর্ণের একজন মানুষের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাকে জুতা দিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করতে থাকে এবং একপর্যায়ে সে প্রাণ হারায়; অথচ একজন পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনো নড়াচড়া করে না, কোনো হস্তক্ষেপ করে না। শুধু এই কারণে যে, নিহত ব্যক্তি তার মতো একই বর্ণের নয়! দেশ, ধর্ম ও ভাষার ভিন্নতা নয়—এখানে একমাত্র অপরাধ তার বর্ণগত পরিচয়। আর সেই পুলিশ সদস্য নির্লজ্জভাবে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের পক্ষ অবলম্বন করে। অথচ এসব ঘটনাকেই বিংশ শতাব্দীতে এসে চূড়ান্ত সভ্যতা, প্রগতি ও উন্নতির নিদর্শন হিসেবে দাবি করা হয়েছে!!
- আফ্রিকার ভিন্ন বর্ণের অধিকারী মানুষের কাহিনিও কম হৃদয়বিদারক নয়। তাদের মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে; হত্যা করা হয়েছে, অথবা ইংরেজি পত্রিকাগুলোর প্রকাশিত নির্লজ্জ ভাষ্য অনুযায়ী—‘তাদের শিকার করা হয়েছে’। (কারণ, তারা সাহসী হয়ে উঠেছিল, নিজেদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল এবং নিজেদের স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছিল।) অথচ এ ধরনের নির্মমতাকেই ব্রিটিশদের কাছে সর্বোচ্চ ন্যায় ও ইনসারফ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে! তারা নিজেদের মিথ্যা শ্লোগান প্রচার করতে যেমন দ্বিধা করেনি, তেমনি বিশ্বের সামনে নিজেদের মিথ্যা, প্রতারণা ও

ধোঁকাবাজির পৃষ্ঠপোষকতা করতেও পিছপা হয়নি। তাহলে একে আমরা কী নামে অভিহিত করব?!!

- অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো নিজেদের জনগোষ্ঠীকে দাস-দাসী বানানো, অথবা তার ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধীনে বিদ্যমান মুসলিমদের সন্তানদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা; নিঃসন্দেহে এটি মানবতার ললাটে অপমান ও অসম্মানের কালিমা লেপন। বরং এটি এমন এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, মানুষকে গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, যার নজির ইতিহাসে নেই!!

তারা যে বিশৃঙ্খলা, গোলামি ও অবৈধ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য গণকবর সৃষ্টি করেছে এবং রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছে, সে সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখো। সেই রক্ত ও লাশের ওপর ভর করেই আজ সমাজতন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। (তাহলে এটাকেই কি তোমরা স্বাধীনতা বলবে?)

- সমাজতান্ত্রিক চীন ও রাশিয়া প্রতি বছর গড়ে এক মিলিয়ন করে মোট ১৬ মিলিয়ন মুসলিমকে হত্যা বা নির্মূল করেছে। (এটাকেও কী স্বাধীনতা বলা হবে?)
- সমাজবাদী যুগোশ্লাভিয়াও মুসলিম সম্প্রদায়কে কঠিন বিপদ ও নির্যাতনের মুখে ঠেলে দিয়েছে, এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে সময়ের মধ্যে সে দেশটিতে সাম্যবাদী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, সে সময়ে দেশটি এক মিলিয়ন মুসলিমের জীবনহানি করেছে এবং নির্মূল করার কাজ ও বর্বর শাস্তি দানের ব্যাপারটি এখন পর্যন্ত অবিরাম চলছে।
- যুগোশ্লাভিয়ায় যা ঘটছে, সে যুগের অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও অনুরূপ নিপীড়ন ও নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে।
- আমরা দক্ষিণ ইয়ামেনে সংঘটিত কত হৃদয়বিদারক সমাজতান্ত্রিক কসাইখানার কথা শুনেছি! আজ আফগানিস্তানেও অনুরূপ ভয়াবহতার কথা শোনা যাচ্ছে। আর এ ধরনের ঘটনা এমন প্রতিটি স্থানেই

সংঘটিত হয়েছে, যেখানে তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
(তাহলে এসবকেও কি স্বাধীনতা বলা হবে?)

- অতীতে ইরাকেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধ্বংসাত্মক হাতে সংঘটিত বহু কসাইখানার কথা আমরা শুনেছি। আবদুল করীম কাসেমের শাসনামলে মসুল শহরে তাদের পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞ ও নৃশংসতার কথাও ইতিহাসে আলোচিত হয়েছে। আমরা আরও শুনেছি সেখানকার মুমিন দাঈ (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তিদের) এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর চালানো নির্যাতনের কথা; তাদের বন্দী ও কারারুদ্ধ করা, হত্যা করা এবং পঙ্গু করে দেওয়ার মতো অসংখ্য বর্বরতার কথাও জানা যায়।

(তাহলে প্রশ্ন হলো—এসবই কি স্বাধীনতা? এসবই কি মানবাধিকার? এসবই কি সভ্যতা, ন্যায় ও ইনসাফের চূড়ান্ত নিদর্শন?)

- আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [البُورِج: ৮]

“আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এ কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল পরাক্রমশালী ও প্রশংসার যোগ্য আল্লাহর ওপর।” [সূরা আল-বুরূজ: ৮]

তাদের অপরাধ কী ছিল? তারা শুধু বলেছিল—‘আল্লাহ আমাদের রব।’ তারা আর কোনো অপরাধ করেনি। তারা নাস্তিক্যবাদী মতবাদ, ধর্মবিরোধী নীতিমালা এবং ধর্মবিরোধী শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর এরই পরিণতিতে তাদের ওপর নেমে এসেছিল নির্যাতন, কারাবাস, হত্যা ও নিপীড়ন। এটাই কি ছিল তাদের পরিণতি এবং এটাই কি ছিল তাদের পুরস্কার!!

কেউ একজন অত্যন্ত চমৎকারভাবে এ পরিস্থিতির তুলনা করেছেন:

قَتَلَ امْرِئِي فِي غَايَةٍ جَرِيْمَةً لَا تُعْتَفَرُ

وَقَتَلَ شَعْبٍ آمِنٍ مَسْأَلَةٌ فِيهَا نَظَرٌ

“জঙ্গলের মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ;

আর নিরাপদ জনগোষ্ঠীকে হত্যা করা এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে ভাবার অবকাশ আছে।”

এ হচ্ছে চিন্তা ও বিশ্বাসকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার একটি দিক। পক্ষান্তরে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে কীভাবে দাসত্বের অধীনে নিয়ে যাওয়া হয়, সে বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে তার তো কোনো কুল-কিনারা নেই।

সমাজতান্ত্রিক শাসনের অধীনে বসবাসকারী একজন মানুষ তার ইচ্ছামতো পেশা ও কর্মক্ষেত্র বেছে নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। তার নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে না; তার সামনে যে কোনো বক্রতা, ব্যর্থতা কিংবা ভুল নীতি ও ব্যবস্থাপনার সমালোচনা করার অধিকারও থাকে না। এমনকি নিজের সম্পত্তির মালিক হওয়া কিংবা স্বাধীনভাবে কোথাও ভ্রমণ করার অধিকারও তার সীমাবদ্ধ থাকে। তার কথা বলার অধিকার নেই; এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ‘কেন?’—এই প্রশ্নটুকু করারও অধিকার থাকে না।

ফলে সে পরিণত হয় সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ এক শৃঙ্খলিত দাসে—যার স্বাধীন পছন্দ, মতামত, ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার কোনো মূল্য থাকে না।

আর যখন কর্তৃপক্ষ তার সম্পর্কে অনুভব করে যে, সে কোনো ইঙ্গিত, কথা কিংবা কাজের মাধ্যমে কোনো পরিস্থিতি, দৃষ্টিভঙ্গি অথবা প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা করেছে, তখন তার নিশ্চিত পরিণতি হতে পারে মৃত্যু, কারাবাস কিংবা সাইবেরিয়ায় নির্বাসন!!

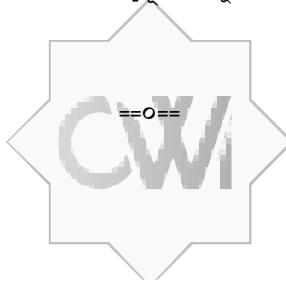
এ হলো সুস্পষ্ট দাসত্বেরই এক নতুন রূপ—যাকে বিশ্বে ‘সভ্যতা’, ‘প্রগতি’ ও ‘বৈপ্লবিক নীতিমালা’ ইত্যাদি আকর্ষণীয় নামের আড়ালে উপস্থাপন করা হয়েছে। দাসত্বের এসব নতুন রূপ জনগণকে তাদের অধিকার দাবি করা থেকে বিরত রেখেছে এবং শক্তি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে

এই নতুন দাসত্বব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য করেছে। লোহা ও আগুনের শক্তি প্রয়োগ করে তাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং সেই কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়েছে!!

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো—রংবেরঙের নাম, আকর্ষণীয় শ্লোগান ও চমকপ্রদ শব্দের দ্বারা যেন আমরা প্রভাবিত না হই। কারণ, এত কিছুর পরও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—কোনো স্থানেই দাসত্বের অবসান ঘটেনি। বরং দাসত্ব নতুন নতুন রং, পদ্ধতি ও কৌশল ধারণ করেছে (যেগুলো সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সবসময় সহজে ধরা পড়ে না)। আল-কুরআনের ভাষায়:

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١]

“কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।” [সূরা ইউসুফ: ২১]



বৈধভাবে দাস-দাসী গ্রহণের বিধান

ইসলামে দাসত্বপ্রথা সম্পর্কে জানা কথা হলো, ইসলাম মনিবের জন্য বৈধ করে দিয়েছে যে, তার নিকট যুদ্ধ বন্দীদের থেকে কিছু সংখ্যক দাসী থাকতে পারবে এবং সে এককভাবে তাদেরকে উপভোগ করতে পারবে; আর ইচ্ছা করলে সে কখনও কখনও তাদের মধ্যে কাউকে বিয়ে করতে পারবে। আল-কুরআন এ ধরনের ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿...وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۚ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ﴾ [المؤمنون: ৬, ৫]

“...আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে রাখে সংরক্ষিত, নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া, এতে তারা হবে না নিন্দিত।” [সূরা আল-মুনিুন: ৫-৬]

এই বিধানকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যবিদ, পাশ্চাত্যবিদ এবং ইসলামবিরোধী নাস্তিকদের কেউ কেউ আপত্তি উত্থাপন করে বলে থাকে: কীভাবে ইসলাম দাসীপ্রথাকে বৈধতা দিতে পারে? কীভাবে একজন পুরুষকে একাধিক নারীর সঙ্গে যৌনসম্পর্কের সুযোগ দেওয়া হয়? এতে কি নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না? এটি কি কেবল পুরুষের যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের একটি ব্যবস্থা নয়?

বান্দী বা দাসী ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তৈরি করা যে সন্দেহ-সংশয়টিকে ইসলামের শত্রুগণ উস্কিয়ে দেয়, আমি তার জবাব দেওয়ার পূর্বে এই দুটি’র বাস্তবতা তুলে ধরতে চাই:

১. একজন মুসলিমের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে কোনো বন্দীনারী’র সাথে তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না

বিচারক কর্তৃক তাদের বান্দী বা দাসী হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়।

২. মুসলিম ব্যক্তির জন্য (কোনো বন্দীনার সাথে) তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করা বৈধ হবে না, তবে বৈধভাবে তার মালিক হওয়ার পর তার জন্য তা বৈধ হবে।

যুদ্ধবন্দীনীকে দাসী বানানোর পর দুই অবস্থায় ছাড়া সে কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ মালিকানায় আসবে না:

প্রথমত: নারীটি তার গণিমতের অংশ হওয়া।

দ্বিতীয়ত: অন্যের নিকট থেকে তাকে ক্রয় করা, যখন সে তার মালিকানাভুক্ত হয়।

আর সে তার মালিকানাভুক্ত হওয়ার পরপরই তার জন্য তাকে স্পর্শ করা বৈধ হবে না, গর্ভের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সে কমপক্ষে এক ‘হায়েয’ তথা একটি মাসিকের মাধ্যমে তার গর্ভাশয় পবিত্র করে নেওয়ার পর তাকে স্পর্শ করতে পারবে। অতঃপর সে ইচ্ছা করলে তার নিকট গমন করতে পারবে, যেমনিভাবে সে তার স্ত্রীর নিকট গমন করে।

এই বাস্তব বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর আমি ওই সন্দেহের ব্যাপারে জবাব দিব, যা ইসলামের শত্রুরা বৈধ পন্থায় দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে উস্কে দিয়েছে:

পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, কোনো দাসী যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তির মালিকানাধীন থাকে, তখন তার মালিকের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা ন্যায় তার সঙ্গেও মেলামেশা করা বৈধ। অতঃপর সেই দাসী যদি তার (মনিবের) জন্য সন্তান প্রসব করবে, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে ‘উম্মুল ওলাদ’ (সন্তানের মা) হবে। এ অবস্থায় মনিবের জন্য তাকে বিক্রি করা হারাম হয়ে যাবে।

আর যদি মনিব তার জীবদশায় তাকে আযাদ না করেই মারা যায়, তাহলে তার মনিবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্বাধীন হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে তার ‘মুকাতাবা’ পদ্ধতির মাধ্যমে তার স্বাধীনতা দাবি করার অধিকার থাকবে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। সে অনুযায়ী মুকাতাবার চুক্তি সম্পন্ন হলে নির্ধারিত শর্ত পূরণের মাধ্যমে সে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করবে।

অতএব, ইসলাম যখন মনিবের জন্য দাসী রাখার বিষয়টিকে বৈধ করেছে, তখন একই সঙ্গে দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার, তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং ধীরে ধীরে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেওয়ার পথও উন্মুক্ত করেছে। পাশাপাশি তাদের গৃহহীনতা, অসহায়ত্ব ও ব্যভিচারের মতো অনৈতিক কর্মকাণ্ডের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করার কার্যকর ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে।

যে সময়ে অমুসলিম সমাজব্যবস্থায় যুদ্ধবন্দি নারীদেরকে তাদের কোনো পরিবার বা আশ্রয় নেই—এই অজুহাতে অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অশ্লীলতার দিকে ঠেলে দেওয়া হতো, তখন তাদের আত্মমর্যাদা ও সম্মান রক্ষার ব্যাপারে তাদের মনিবদের কোনো দায়বদ্ধতা ছিল না। বরং অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধবন্দি নারীদের দাসী হিসেবে গ্রহণ করার পর তাদেরকে যিনা-ব্যভিচারের পেশায় নিয়োজিত করা হতো। তাদের সম্মান ও সম্মতিকে নোংরা ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জনের পণ্যে পরিণত করা হতো এবং এভাবে তাদের মানবিক মর্যাদাকে পদদলিত করা হতো!!

কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকৃত ধারক মহান ইসলাম ব্যভিচারের এই প্রথাকে কখনো অনুমোদন করেনি এবং দাসীদের সঙ্গে এ ধরনের নোংরা আচরণও সমর্থন করেনি। বরং ইসলাম তাদের সুনাম, সুখ্যাতি ও নৈতিক চরিত্র রক্ষার প্রতি উৎসাহিত করেছে। একই সঙ্গে যিনা-ব্যভিচারের কলঙ্ক এবং যৌন স্বেচ্ছাচারিতা ও নৈতিক নৈরাজ্য সমাজে ছড়িয়ে পড়া থেকে পবিত্রতা ও শালীনতা রক্ষার নির্দেশ দিয়েছে।

এ কারণে দাসীদেরকে অবাধ ও অনিরাপদ অবস্থায় ছেড়ে না দিয়ে তাদের দায়িত্বশীল মনিবের তত্ত্বাবধানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মনিবের দায়িত্ব হলো—তাদের খাবার ও পোশাকের যথাযথ ব্যবস্থা করা, তাদেরকে পাপাচার ও অপরাধ থেকে রক্ষা করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার ও চাহিদা পূরণ করা। তাদের সঙ্গে সদ্যবহার করা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা তার কর্তব্য।

পাশাপাশি ইসলাম দাসত্ব থেকে মুক্তির পথও সুগম করেছে। দাস-দাসীদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়ে ‘মুকাতাবা’ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদেরকে চুক্তির ভিত্তিতে নিজেদের মুক্তির ব্যবস্থা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে একজন দাসী তার মনিবের কাছে স্বাধীনতার দাবি করতে পারে এবং নির্ধারিত শর্ত পূরণের মাধ্যমে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।

আর কোনো দাসী যদি তার মনিবের সন্তান প্রসব করে, তবে সে ‘উম্মুল ওলাদ’ (সন্তানের মা) হিসেবে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। এর ফলে তার মুক্তির পথ আরও সুগম হয় এবং তার অবস্থান পূর্বের তুলনায় অধিক মর্যাদাপূর্ণ হয়ে ওঠে। এভাবে ইসলাম দাসত্বের বাস্তবতাকে একদিকে নিয়ন্ত্রণ ও মানবিকতার আওতায় এনেছে, অন্যদিকে বিভিন্ন বিধান ও ব্যবস্থার মাধ্যমে ধীরে ধীরে দাসত্বমুক্তির পথ প্রশস্ত করেছে।

অপরাপর সামাজিক শাসন ব্যবস্থায় এ ধরনের ব্যবহার কোথায়, যে শাসন ব্যবস্থায় ব্যভিচারে বাধ্য করার মাধ্যমে দাসীর প্রতি অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিপন্ন করার দৃষ্টিতে তাকানো হয় এবং যাতে অপরাধীরা তাদের সাথে মজা উপভোগের কার্যাবলি পরিচালিত করে এবং তাদেরকে লাম্পটের সস্তা উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করে?

আর বর্তমান ইউরোপীয় ও প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলো নারীকে দাসী বানানোর জন্য অন্য এক কর্মপন্থা অনুসরণ করেছে। এই কর্মপন্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো—সেখানে ব্যভিচারকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে এবং আইনের

তত্ত্বাবধানে তাকে অনুমোদন করা হয়েছে। অতঃপর প্রতিটি দেশে এর প্রভাব উপনিবেশিক বিস্তারের মতো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

সুতরাং শুধু নাম ও শিরোনাম পরিবর্তন করলে দাসত্বের প্রকৃতিই বা কীভাবে পরিবর্তিত হবে? খোলস পরিবর্তন করা ব্যভিচারের মহত্বই বা কোথায়, যখন একজন নারী তার ওপর জোরপূর্বক আত্মসনকারীকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকারও রাখে না? যখন তাকে কামনা করা হয় কেবল নোংরা ও অশ্লীল উদ্দেশ্যে, তখন তার মানবিক মর্যাদা কোথায় থাকে? এই ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও নোংরামির সঙ্গে ইসলামে দাসী ও তার মনিবের মধ্যকার সম্পর্কের কোনো তুলনা কি আদৌ চলে?

হ্যাঁ, ইসলাম ব্যক্তি ও জনগণের সামনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছে। ইসলাম বলেছে—এটি দাসত্ব এবং এরা দাসী; তাদের সঙ্গে আচরণের সীমারেখাও নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু ইসলাম কখনো বলেনি যে, দাসত্ব মানবতার জন্য একটি স্থায়ী আদর্শ, কিংবা ভবিষ্যতেও এটি মানবিক মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ব্যবস্থা হিসেবে বহাল থাকবে। বরং এটি ছিল যুদ্ধকালীন একটি বিশেষ ব্যবস্থা—যখন যুদ্ধরত জাতিগুলো যুদ্ধবন্দীদের দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করার প্রথার সঙ্গে পরস্পর পরিচিত ছিল।

কিন্তু বর্তমান যুগের তথাকথিত সভ্যতার মধ্যে আপনি সেই স্বচ্ছ ও বাস্তব চিত্রটি দেখতে পাবেন না। কারণ, এই সভ্যতা ব্যভিচারকে ‘দাসত্ব’ নামে অভিহিত করে না; বরং তাকে অভিহিত করে—‘সামাজিক প্রয়োজন’ নামে!

কেন এই প্রয়োজন?

কারণ, একজন ইউরোপীয় সংস্কৃতিবান ব্যক্তি কিংবা প্রাচ্যবাদী মুক্তচিন্তার অধিকারী ব্যক্তি কোনো নারী ও তার সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব নিতে চায় না। সে স্ত্রী কিংবা সন্তান—কারও দায়িত্বই গ্রহণ করতে চায় না। সে কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব বহন না করেই ভোগ-বিলাস করতে চায়। সে নারীর

দেহ কামনা করে, কিন্তু তার প্রতি কোনো দায়িত্ব স্বীকার করতে চায় না। নারীর ভবিষ্যৎ, তার মর্যাদা কিংবা তার মানসিক অনুভূতি—কোনোটিই তাকে চিন্তিত করে না। পুরুষের কামনা ও বাসনাই সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে, আর নারী পরিণত হয় সেই কামনা পূরণের একটি মাধ্যমমাত্র!!

এটাই তাদের তথাকথিত ‘সামাজিক প্রয়োজন’—যার মাধ্যমে আধুনিক যুগে পশ্চিম ও প্রাচ্যের বহু সমাজে নারীদের যৌন শোষণকে একপ্রকার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। অথচ কোনো ইউরোপীয় বা প্রাচ্যবাদী ব্যক্তি যদি সত্যিকার অর্থে ‘মানবতার’ স্তরে উন্নীত হয় এবং তার অধীনস্থ কিংবা তার সংস্পর্শে আসা মানুষকে নিজের কামনা-বাসনা পূরণের উপকরণ হিসেবে বিবেচনা না করে, তাহলে এই ব্যবস্থাকে ‘সামাজিক প্রয়োজন’ বলে অভিহিত করার সুযোগ থাকে না।

আর সভ্যতার দাবিদার পশ্চিমা বিশ্বে যেসব রাষ্ট্র ব্যভিচার প্রথাকে বাতিল করে দিয়েছে, সেসব রাষ্ট্র তা এজন্য বাতিল করেনি যে, তা তার মান-মর্যাদাকে নষ্ট করে দিয়েছে, অথবা এজন্য নয় যে, তার নৈতিক, মানসিক ও আত্মিক মান অপরাধ প্রবণতা, জাতিগত সম্পর্কসহ সকল দিক থেকে উন্নত হয়ে গেছে! বরং তারা তা বাতিল করেছে শ্রেণিগত কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তির পূজা করার ক্ষেত্রে আসক্তির সূচনা পেশাদারিত্বে রূপ নেওয়া এবং রাষ্ট্র তাতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে বলে মনে না করার কারণে!!

এরপরও পশ্চিমা বিশ্ব অহংকারের সঙ্গে তেরশ বছর পূর্বে ইসলামে প্রচলিত দাস-দাসী ব্যবস্থার সমালোচনা করে। অথচ ইসলামের সেই ব্যবস্থা ছিল একটি বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত, পরিবর্তনবাহক এবং বিভিন্ন বিধিনিষেধ ও নৈতিক দায়িত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিপরীতে আধুনিক যুগে যে ধরনের যৌন শোষণ, দেহব্যবসা ও মানবদেহের পণ্যায়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে অনেক ক্ষেত্রে নগরসভ্যতা, অগ্রগতি ও প্রগতিবাদের নামে স্বাভাবিক করে তোলা হয়েছে। সমাজে এর উপস্থিতি দীর্ঘদিন ধরে থাকলেও এর মৌলিক পরিবর্তনের জন্য সর্বত্র কার্যকর

প্রচেষ্টা দেখা যায় না। বরং যতদিন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা এসব প্রবণতাকে টিকিয়ে রাখে এবং মানুষ ভোগবাদ ও কুপ্রবৃত্তির মধ্যে অবাধে নিমজ্জিত হতে থাকে, ততদিন এ ব্যবস্থাও বিভিন্ন রূপে টিকে থাকে।

কেউ সাধারণত এ কথা বলে না যে, এসব ‘পতিতা’ কোনো ধরনের বলপ্রয়োগ ছাড়াই স্বেচ্ছায় অশ্লীলতার পথ বেছে নিয়েছে এবং তারা পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী। কারণ, মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্নটি শুধু বাহ্যিক ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না; বরং তার পেছনে থাকা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও চারিত্রিক বাস্তবতাও বিবেচনায় নিতে হয়। অতীতেও এমন বহু দাস-দাসী ছিল, যারা স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাওয়ার পরও বিভিন্ন কারণে দাসত্বের জীবনেই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই অবস্থানকে দাসত্বপ্রথার নৈতিক বৈধতার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। একইভাবে, কোনো নারী অর্থনৈতিক বা সামাজিক চাপে কোনো পেশায় প্রবেশ করলে তার বাহ্যিক সম্মতিকে সবসময় প্রকৃত স্বাধীনতার সমার্থক বলা যায় না।

এখানে মূল বিবেচ্য বিষয় হলো এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা, যা মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও চারিত্রিক বাস্তবতাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে, মানুষ অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান গ্রহণ করতে কিংবা সেই অবস্থানে অব্যাহত থাকতে বাধ্য হয়।

কোনো সন্দেহ নেই যে, ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যে খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি ও পাপাচারমূলক পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে, তা ব্যাভিচারের দিকে ঠেলে দেয় এবং তাকে স্বীকৃতি প্রদান করে, চাই সেই ব্যাভিচারটি নিয়মানুসারে হোক, অথবা তা স্বেচ্ছাচারিতামূলক ব্যাভিচার হোক!

এটাই বিংশ শতাব্দীর ইউরোপ ও ইউরোপের বাইরের বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত তথাকথিত ‘আধুনিক দাসত্বের’ একটি চিত্র—পুরুষের দাসত্ব, নারীর দাসত্ব, জাতি ও গোষ্ঠীর দাসত্ব, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের দাসত্ব;

প্রয়োজনের অজুহাতে কিংবা অপ্রয়োজনে দাসত্বের নতুন নতুন উৎস ও প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করা।

এসবই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সেই সামাজিক বাস্তবতার বিভিন্ন দিক, যেখানে মানুষের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য, স্বৈচ্ছাচারিতা, ভোগবাদ এবং মানবিক মর্যাদার অবমূল্যায়ন নানা রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

==O==



অতএব, হকের অনুসন্ধানীগণ!

এটাই ইসলামের দাসত্বনীতি—মানবজাতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় এবং মানবতার রেজিস্টারে এক গৌরবময় পৃষ্ঠা। আপনারা দেখেছেন, ইসলাম বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ ও শরিয়তের মৌলিক নীতিমালার মাধ্যমে দাস-দাসীদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করেছে। একই সঙ্গে দাসত্বের প্রাচীন ও প্রচলিত উৎসসমূহ বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে সেগুলো নতুন করে বিস্তার লাভ করতে না পারে। কেবল একটি উৎস—যুদ্ধের মাধ্যমে দাসত্বে পরিণত হওয়া—শরীয়তসম্মত যুদ্ধের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট রেখেছে।

যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বাস্তবতা ও আবশ্যিকতার কারণে এই একমাত্র উৎসটি পুরোপুরি বন্ধ করা হয়নি; কারণ কখনো কখনো এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যখন যুদ্ধের বাস্তবতা মোকাবিলায় এর বিকল্প থাকে না। তদুপরি, এর সঙ্গে বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থও জড়িত থাকতে পারে—যার বাস্তবায়নে সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বিশেষত এমন রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘাতের ক্ষেত্রে, যাদের ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো কর্তৃত্ব নেই এবং যেখানে জাতির সামগ্রিক স্বার্থের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হয়।

আর আপনারা নিশ্চয় দাসত্বনীতির ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের মহত্ত্ব অনুধাবন করেছেন। শরিয়ত মুসলিমদের শাসককে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ব্যাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়েছে। তিনি পরিস্থিতি ও সামগ্রিক কল্যাণ বিবেচনা করে চারটি ব্যবস্থার যেকোনো একটি গ্রহণ করতে পারেন—অনুকম্পা প্রদর্শন করে মুক্তি দেওয়া, মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দেওয়া, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া অথবা দাসত্বে পরিণত করা।

এর ওপর ভিত্তি করে মুসলিম শাসক বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সকল যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে বন্দী হওয়া যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী বানানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে চুক্তি করতে পারবেন, যেমনিভাবে সুলতান

‘মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ’ তাঁর সমকালীন সময়ের রাষ্ট্রসমূহের সাথে দাস-দাসী প্রথা বিলুপ্ত করার ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন!!

যে সময়ের মধ্যে এই মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইসলাম তার প্রধান মূলনীতির দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যাকে সে সুস্পষ্ট ভাষায় পুরাপুরিভাবে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে: ‘সবার জন্য স্বাধীনতা’, ‘সকলের জন্য সমতা’ এবং মানবিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকার সবার জন্য!!

একথা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, ইসলাম দাস-দাসী মুক্ত করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে সাতশত বছর পূর্বে, ইউরোপে দাস-দাসী মুক্ত করার দ্বারা ফরাসি বিপ্লবের অহমিকা প্রকাশ করার পূর্বে, আমেরিকায় ‘আব্রাহাম লিংকন’ কর্তৃক দাস-দাসী মুক্ত করার দ্বারা বাকপটুতা প্রকাশ করার পূর্বে এবং ‘জাতিসংঘ’ কর্তৃক বিশ্ব মানবাধিকারের মূলনীতি ঘোষণাও বহু পূর্বে।

এ সত্য একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মানুষের প্রত্যয়কে আরও দৃঢ় করবে যে, আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের উত্তরাধিকারী হওয়ার দিন অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম হচ্ছে স্বাধীনতা ও মুক্তির ধর্ম; সম্মান, মর্যাদা ও মানবিক জীবনের ধর্ম; সর্বোপরি একটি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত তথা জীবনবিধান!!

জেনে রাখুন! প্রাচ্যবিদ, পাশ্চাত্যবিদ, সামাজতান্ত্রিক ও নাস্তিক্যবাদীদের মধ্যে যারা ইসলামের বিরোধিতা করে তাদের বুঝা উচিত যে, এই মহান ইসলাম আল্লাহ তা‘আলার চিরস্থায়ী দীন, সার্বজনীন শরীয়ত তথা জীবনবিধান এবং একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনব্যবস্থা। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এ দীন নাযিল করেছেন স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মূলনীতির ছায়াতলে ব্যক্তির মান-মর্যাদা, পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি, সমাজের ঐক্য এবং মানবতার শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য?

সুতরাং পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের দাঈ ও প্রচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো—মানুষের সামনে ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার ব্যাপারে সর্বাত্মকভাবে তৎপর হওয়া এবং তাদের চোখের ওপর থাকা সন্দেহের পর্দা ও অপবাদ-অভিযোগের মরীচিকা দূর করা। অবশেষে যখন তাদের সামনে সত্যের মাইলফলক সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, বিষয়টি প্রকাশ্য হবে এবং দলিল-প্রমাণ পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হবে, তখন দ্বিধাগ্রস্ত প্রাণগুলো ঈমানের বাগানে প্রবেশ করবে এবং বিশ্বাসের উদ্যানে আশ্রয় নিবে। তারা সাহস, উদ্দীপনা, কর্মতৎপরতা, দাওয়াত, প্রচার-প্রচারণা ও সংগ্রামের মাধ্যমে শক্তিশালী মুমিনদের কাতারে शामिल হবে।

অনুরূপভাবে, যখন ঈমানের প্রফুল্লতা হৃদয়ের সঙ্গে মিশে যাবে, তখন তা মানুষকে পরিপূর্ণতার উচ্চস্তরে উন্নীত করবে, সাহসী ও মহৎ ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় পৌঁছে দিবে এবং মুত্তাকি ও সত্যপথের অনুসারীদের সর্বোত্তম পথে পরিচালিত করবে।

বের করে আনবে জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের, যেমনিভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম ঈমানী মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন আবু বকর, উমার, খালিদ, উসামা এবং উম্মে আস্মারের মতো মহান ব্যক্তিত্ব।

অতএব, হে ইসলামের দাঈগণ! দাওয়াতি কাজ ও প্রচারমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি করুন। অচিরেই আমরা মুসলিম যুবকদের ইসলামের দিকে ফিরে আসতে দেখতে পাব—ইনশাআল্লাহ। আশা করা যায়, একদিন দিগন্তে আমরা ইসলামের অগ্রগামী সৈনিকদের কুচকাওয়াজ দেখতে পাব। মুসলিম জাতি ফিরে পাবে তার হারানো সম্মান ও মর্যাদা; ফিরে পাবে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরব, যা কালের চক্রে অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে। আর এ কাজ আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়।

পরিশেষে আল-কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ١٠٥]

“আর বলুন, ‘তোমরা কাজ করতে থাক; আল্লাহ তো তোমাদের কাজকর্ম দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও।’” [সূরা আত-তাওবা: ১০৫]

وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(আর আমাদের শেষ ধ্বনি হলো: ‘সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য’)।

সমাপ্ত

